শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২১ ● জুলাই-আগস্ট ২০১৪ ● রমজান-সওয়াল ১৪৩৫

আল-আমীন মিশন ট্রাস্ট

শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান

উমর আলি: এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সারা রাজ্যের ৬৪ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে উমর আলির র‍্যাঙ্ক ৩২। ২০১১ সালে মিশনের পাঁচুড় শাখায় প্রায় বিনা-বেতনে ভর্তি হয়ে ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয় ৭৬.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে। এ-বছর মিশনের খলিসানি শাখায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। উমরের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার নতুনপাড়া গ্রামে। তার আব্বা ঘরামির কাজ করেন, সামান্যই উপার্জন। অভাবের সংসারে উমরের মা বিড়ি বাঁধার কাজ করে কিছুটা অভাব সামলান। এহেন উমরের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা বড়ো আনন্দিত। উমরদের অনটনের ঘরের উঠোনে আজ স্বপ্নের চাঁদ সোনার আলো ফেলেছে, সে-আলোয় উজ্জ্বল তার চারপাশ।

তাবাসসুম খাতুন: হুগলি জেলার কুমিরমোড়া গ্রামের তাবাসসুম খাতুন আজন্মকাল দেখে আসছে, তার আব্বা মানসিক ভারসাম্যহীন। তাদের পরিবার অনেকটা নির্ভর করে আত্মীয়পরিজনের সাহায্যের ওপর। তাই সে ছোটো থেকেই স্বপ্ন দেখত বড়ো হওয়ার। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে তাবাসসুমের সে-স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। বিনা-বেতনে একাদশ শ্রেণিতে মিশনের মেমারি শাখায় ভর্তি হয় সে। এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে ৫৮ র‍্যাঙ্ক করেছে উলুবেড়িয়া শাখা থেকে। ডাক্তারিতে নিউরোলজি নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে সে তার আব্বার চিকিৎসা করতে চায়। পিতার জন্য সন্তানের এই আকুতিভরা ইচ্ছা যেকোনো মানুষের কাছে পরম সুখের কথা। আমরা তার জন্য দোয়া করি।

একটি আবেদন

আপনারা জানেন যে, আল-আমীন মিশন দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে রাজ্য এবং সম্প্রতি রাজ্যের বাইরেও সংখ্যালঘু সমাজের শিক্ষা বিস্তারে নিরলসভাবে কাজ করছে। মিশন আজ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে থাকা দুঃস্থ এতিম অসহায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাহারা হয়ে উঠেছে। উমর আলি আর তাবাসসুম খাতুন দুটি উদাহরণ মাত্র।

বর্তমানে ৪১-টি শাখায় মিশনের মোট আবাসিক ছাত্রছাত্রী ৭৪৫৬ জন। দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী ১৮৩৭ জন। এদের থাকা খাওয়া ও পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করা হয় মিশনের 'জাকাত ফান্ড' থেকে। এ- জন্য খরচ হয় বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকা। এই ফান্ড থেকেই দেওয়া হয় আল-আমীন মেরিট স্কলারশিপ। এ ছাড়াও মিশন অর্ধেক ভরতুকি দেয় আরও ৩০৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে।

পৃথিবীর সমস্ত মহৎ কাজের পেছনেই থাকে কিছু মহৎ মানুষের ভূমিকা। মিশন গড়ার কাজেও আপনাদের সেই ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই এই পবিত্র রমজান মাসে আপনার জাকাতের একটা অংশ মিশনের দুঃস্থ এতিম অসহায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য দান করার আবেদন জানাই। হয়তো যারা হারিয়ে যেত, আপনার দান ও আন্তরিক দোয়ায় তারাই একদিন ইমানের সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে, ইনশাআল্লাহ্।

মিশনের উন্নয়নের সাথে সাথে আমরা শুরু করতে চলেছি বহু আকাঙ্ক্ষার 'আল-আমীন জামে মসজিদ', সেইসঙ্গে মেয়েদের জন্য নামাজঘর ও লাইব্রেরি। আপনাদের সকলের দানেই তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই মিশন। তাই আপনাদের দানের ওপরই আবার ভরসা রাখছি, ভরসা রাখছি আপনাদের দোয়ার ওপর।

আপনি জাকাত পাঠাতে পারেন **'Al-Ameen Mission Trust'**-এর নামে নীচের যেকোনো ঠিকানায়। অথবা সরাসরি পাঠাতে পারেন A/C No. 1398104000002073, IDBI Bank Limited, Mugkalyan (Nuntia) Branch, IFSC: IBKL0001398-তে। আয়কর আইনের ৮০ জি ধারায় মিশনে যেকোনো ধরনের দান আয়করমুক্ত।

আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর আশা রাখছি। আমীন।

এম নুরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ৭১২ ৪০৮ ফোন: ৯৪৩৪৬ ২০৯২০

সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯; ৩২৯৭ ৩৫৮০

আল-আমীন বার্তা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২১ • জুলাই-আগস্ট ২০১৪ • রমজান-সওয়াল ১৪৩৫ । চতুর্থ বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা

মিশন সমাচার

আসাদুল ইসলাম
আমরা সবাই সেরা ০৬

বিশেষ নিবন্ধ

মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম
রমজান ও বিজ্ঞান ১৩

দিনগুলি রাতগুলি

রোহণ কুদ্দুস
আমার মিশন মিশনের আমি ১৫

সেই সময়

একরামুল হক শেখ
আল-জাহ্‌রাবি
আধুনিক শল্যচিকিৎসাবিদ্যার জনক ২০

মুক্তভাষ

ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভ
গঙ্গাফড়িংয়ের টেলিফোন ২৪

স্মরণ

আমিনুল ইসলাম
মীর মশাররফ হোসেন
সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা ২৬

বিশ্ববিচিত্রা

ফরিদা নাসরিন
বিশ্বকাপ ফুটবলের পাঁচকথা ৩১

হাজারদুয়ারি

মহম্মদ মহসীন আলি
স্কলারশিপের সাত-সতেরো ৩৩

রূপকথা

সংগ্রাহক ভ্লাদিমির বইকো
মায়া-ডিম ৩৭

আরও লেখা

বাণী ০৩
পাঠকনামা ০৪
সম্পাদকীয় ০৫
আমাদের পাতা ৪০

মুদ্রণ বিবরণী

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক সেন্ট্রাল অফিস ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা • **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯; ৩২৯৭ ৩৫৮০
ফ্যাক্স ৯১৩৩ ২২২৯ ৩৭৬৯
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.in
facebook.com/alameen.barta

কল্যাণবাহী বায়ুর শপথ এবং প্রলয়ংকরী ঝটিকার শপথ, মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ুর শপথ এবং মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ, শপথ বায়ুর, যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছে দেয়— যাতে ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে এবং তোমরা সতর্ক হও।

— আল-কোরআন, সুরা মুরসালাত, আয়াত ১—৬।

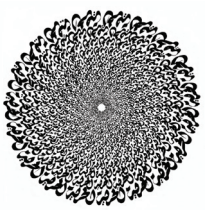

আবু হোরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক বেদুইন নবি করিম (স.)-এর নিকটে এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যেটি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবি করিম (স.) বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজ আদায় করবে, ফরজ জাকাত আদায় করবে এবং রমজানের রোজা পালন করবে।

— সহিহ্ বোখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ১৩১৫।

ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞ

কলেজ স্ট্রিটে একটি পত্রিকার স্টলে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। স্বাভাবিকভাবেই একটি ঝকঝকে, সুন্দর রুচিসম্পন্ন মলাটের পত্রিকা চোখে পড়ল। নাম 'আল-আমীন বার্তা'। নামাঙ্কনের মধ্যেই রয়েছে একটি ভিন্নধর্মী আর্ট। এপ্রিল ২০১৩, জুলাই ২০১৩— দুটি সংখ্যাই নিলাম। অবাক হয়ে গেলাম পত্রিকার ভিতরে প্রবেশ করে। পাঠকনামা থেকে শুরু করে সম্পাদকীয়, মিশন সমাচার, বিশ্ববিচিত্রা, আমার বাড়ি আল-আমীন, আমাদের পাতা— সব ক-টি বিভাগ যেন ছবির মতো সাজানো। এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি ব্র্যাডলি বার্টের 'হাজি মহম্মদ মহসিন'। এমন একজন মহান মানুষ শিক্ষাবিস্তারে কী পরিমাণ ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন, তা আজকের যুগে আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। নিঃশব্দে তাঁর দুই শত মৃত্যুবার্ষিকী অতিবাহিত হল। আমরা নীরব দর্শকের মতো শুধু তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর অতুলনীয় দানের কথা আমরা প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়েছি। তবে আশার কথা, খুব সামান্য হলেও, ইদানীং তাঁকে নিয়ে কিছুটা চর্চা দুই বাংলার মানুষের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। আবু রিদা সম্পাদিত 'তালিম' (হাজি মহম্মদ মহসিন সংখ্যা), মকবুল মাহফুজ, হাশমৎ আলি, ড. আমজাদ হোসেন, সেখ আজিবুল হক প্রমুখ সুধী জনের শুভপ্রয়াস আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসিন সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করেছে। তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। সেইসঙ্গে 'আল-আমীন বার্তা'কে ধন্যবাদ জানাই হাজি মহম্মদ মহসিন সম্পর্কিত একটি তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ তুলে ধরার জন্য। 'বিশ্ববিচিত্রা' বিভাগটিও প্রয়োজনীয় বিভাগ।

'আমাদের পাতা' বিভাগটিতে যদি মুসলমান সমাজের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে এত সুন্দর একটি পত্রিকার প্রচার ও প্রসার নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে আর ছাত্রজীবন থেকেই মুসলমান সমাজে একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধও গড়ে উঠবে। বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে আমাদের সমাজের সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, যদি এই বিষয়টি ভেবে দেখেন, তবে ধন্য বোধ করব। 'আল-আমীন বার্তা' চিরসবুজ চিরজীবী হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

আসরফী খাতুন
অধ্যাপক, সোনামুখী কলেজ, বাঁকুড়া

আলোপৃথিবীর ঠিকানা

আল-আমীন মিশন শিক্ষাজগতে বিপ্লব আনার পর একটা তথ্যভিত্তিক মুখপত্র 'আল-আমীন বার্তা' প্রকাশ করেছে জেনে খুশি হলাম। মার্চ ২০১৪ সংখ্যাটি হাতে পেয়ে ভীষণ গর্ববোধ করছি। জ্ঞান ও শিক্ষাজগতের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরে আমাদের চেতনার পরিধিকে বিস্তৃতি দান করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে, এই সংখ্যায় একরামুল হক শেখের ফাতিমা আল-ফিহ্‌রির বিষয়ে লেখাটি। তিনিই যে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, তা জানা ছিল না। 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে দক্ষিণ দিনাজপুরের এক অজগ্রামের ছেলে হাজিকুলের সাফল্যের কাহিনিও মনকে পুলকিত করে। কী দারুণ লড়াই করে তিনি আজ একজন সফল ডাক্তার। এসব ছাড়াও আল-আমীন মিশনের উৎসব, শিক্ষাপদ্ধতি, ভর্তির নিয়মনীতি, প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও তার খতিয়ান, অসহায় গরিবদের সহায়তাদান, সুস্থ মানবিক বোধের জাগরণ এবং দেশ-বিদেশের কলাকুশলী ও বিজ্ঞানীদের নানা আবিষ্কার তুলে ধরে জ্ঞানপিপাসা এবং আলোপৃথিবীর ঠিকানা উপস্থিত করেছে। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের গল্প-কবিতা পরিবেশন করেও এই পত্রিকা সুস্থ জীবনবোধ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমে দীক্ষা দিতে পত্রিকার অবদান কম নয়। মাঝে মাঝে সফল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং সমাধান বিষয়েও রেখাপাত করলে ভালো হয়। ছাপা, কাগজ সুন্দর। আরও সুন্দর হয়ে উঠুক।

তৈমুর খান
রামরামপুর, রামপুরহাট, বীরভূম

জানা যায় নতুন দুনিয়া

শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার অনবদ্য পত্রিকা 'আল-আমীন বার্তা' হাতে পেয়ে (জুলাই ২০১৩) একনিমেষে পড়ে ফেললাম। অপূর্ব প্রচ্ছদ। মোহনলাল মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ, সেইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সম্পাদক এম নুরুল ইসলামকে। এরকম একটি ঝকঝকে সুন্দর পত্রিকা সারা বাংলায় পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। এই সংখ্যায় 'পাখির সংকেত পাখির ভাষা' ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভের লেখাটি পড়ে অনেককিছু নতুন তথ্য জানতে পারলাম। বাকিটা পড়ার জন্য পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম। বিশেষ করে সৌকত আলি খানের সাক্ষাৎকার থেকে ছেলেমেয়েরা নতুন কিছু শিখতে পারবে জানতে পারবে। 'বিশ্ববিচিত্রা' থেকে দুনিয়ার ছোটো-বড়ো বিরল আশ্চর্য অজানা জিনিস চোখে পড়ে, জানা যায় নতুন দুনিয়া। 'মিশনের ঋণ এক জীবনে শোধ হওয়ার নয়' লেখায় রোহণ কুন্দুসের সাক্ষাৎকারটি অতি মূল্যবান। শেষে বলি, আর-একটি লেখা 'ভিতর থেকে বদল আনে আল-আমীন', ২০১৩ সালে মেডিকেল জয়েন্টে ৩৫-তম স্থানাধিকারী আবু তালহা পুরকাইতের সাক্ষাৎকারটি ছেলেমেয়েদের পড়া উচিত এবং সেইমতো নিয়ম মেনে পড়াশোনা করা দরকার, তবেই সাফল্য আসবে। সত্যিই আল-আমীন মিশনে পা দিলে ভিতর থেকে বদলে যেতে পারে পড়ুয়া। শেষের দিকে ছবি কবিতা ও গল্পগুলি খুব ভালো।

মইনুল লায়েক
সহ-সম্পাদক, লালপরি-নীলপরি, বর্ধমান

প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাহার

'হাজার দুয়ারি' বিভাগে মহম্মদ মহসীন আলির লেখা খুবই প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাহার। আমাদের সবারই ভালো লেগেছে। এর দ্বারা অনেকেই চিকিৎসা পরিষেবায় কেরিয়ার গড়তে পারবে।

হাবিবুর রহমান
বাগনান, হাওড়া

আল-আমীন বার্তায় কোনো লেখাকে 'প্রচ্ছদ কাহিনি' বলে অভিহিত করা হয় না, তবে কারণবিশেষে একেক সংখ্যায় একেক লেখাকে অন্য লেখার চেয়ে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। গত সংখ্যায় যেমন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস সম্বন্ধে লেখাটি নিয়ে এই কলামে ছিল দু-চারটি কথা।

এবার প্রত্যাশিতভাবেই সবার ওপরে উঠে এসেছে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক আর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আল-আমীন মিশনের ছাত্রছাত্রীদের ফল-সংক্রান্ত নাতিদীর্ঘ একটি বিবরণ— মিশন সমাচার বিভাগে। প্রশ্ন উঠতে পারে, পরীক্ষার ফল নিয়ে আবার লেখার কী আছে? এর উত্তরে বিনীতভাবে বলব, এবারের মিশন সমাচার পড়ুন।

জন্ম থেকেই মানুষের জীবন পরীক্ষাসংকুল। কখনও এমনও পরীক্ষার মুখোমুখি সে হয়, যাতে প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে। তেমন পরীক্ষা না হলেও, উল্লিখিত পরীক্ষাগুলো ছোটো ছোটো ধাপের বড়ো বড়ো পরীক্ষা। বিশেষত, বাংলার পিছিয়ে-পড়া সংখ্যালঘু সমাজের ছেলেমেয়েদের কাছে।

লেখাটি পড়তে পারলে জানা যাবে, মুর্শিদাবাদ জেলার নতুনপাড়া নামের অখ্যাত এক গ্রাম থেকে আসা কোনো এক ঘরামিসন্তান উমর আলির কথা, জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সারাবাংলার চৌষট্টি হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে যার অবস্থান অর্থাৎ র‍্যাঙ্ক ৩২! বাবা যার ঘরামি, তার মা কী করেন? সংসারের ঘানি টানতে তাঁকেও ন্যূনতম উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হয়েছে। হ্যাঁ, তিনি বিড়ি বাঁধেন। শুধু মেধার নয়, এহেন বাবা-মায়ের সন্তানের একাগ্রতা আর জেদের কথাও জানতে হবে। কেননা, ৩২ একটা সংখ্যা মাত্র। সংখ্যা থেকে এক ফোঁটাও অশ্রু নির্গত হয় না, হয় মানুষের চোখ থেকে, যে-চোখে জ্বলে প্রতিজ্ঞার আগুনও। আল-আমীন মিশন তার অশ্রুসিক্ত মেধা আর প্রতিজ্ঞা চিনতে ভুল যে করেনি, সম্পূর্ণ ফ্রিশিপ পেয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষার ফলে উমর সেটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে গেল।

শুধু উমর কেন, আল-আমীন আজ বাংলার এমন বহু উমরের আশ্রয়। আর, শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। যেমন তাবাসসুম খাতুন। হুগলি জেলার কুমিরমোড়া গাঁয়ের মানসিক ভারসাম্যহীন পিতার সন্তান সে। আরও দুই বোন রয়েছে তার। নিঃসহায় গাঁয়ের মেয়েটি আজ আল-আমীনের ফ্রিশিপ পেয়ে মেডিকেলে ছিনিয়ে নিল ৫৮-তম স্থানটি— এ কি গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো সংবাদ নয়!

বিস্তীর্ণ বেলাভূমির এরা দু-একটি কণা মাত্র। আল-আমীনে এমন বহু ছেলেমেয়ে রয়েছে আর অন্যান্য বারের মতো এবারও তাক লাগানো ফল করেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে, উচ্চমাধ্যমিকে আর মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও।

কী করে এটা হয়? একই ঘটনা প্রতি বছর আল-আমীনে কী করে ঘটে? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে মানুষের শরীরের সেই রহস্যময় অঞ্চলে, যেখানে থাকে মন আর মনন। আর আন্তরিকতায় ভরপুর এক প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা। এই দুইয়ের সংমিশ্রণের সঙ্গে সমাজের নানা ব্যক্তির, সংগঠনের আর সরকারের আনুকূল্য এসে যোগ হলে পরীক্ষার এমন ফল প্রতি বছরই হবে ইনশাআল্লাহ্। আল-আমীন বার্তায় এবার সেই জন্যেই মিশন সমাচার বিভাগটিকে একটু বেশিই গুরুত্ব দেওয়া হল। ওই বিভাগটিকে নয়, আসলে গুরুত্ব দেওয়া হল পিছিয়ে-পড়া সমাজের এইসব উমর আলি আর তাবাসসুম খাতুনদের।

আমরা

এবারও তাক লাগানো ফল। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক আর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায়। পুনরাবৃত্তি? না, এবার আরও গর্বিত করেছে আল-আমীনের ছেলেমেয়েরা। এটাই এখন খবর। এই বিভাগে সেইসব সফল ছেলেমেয়েদের কথা, সমাচার।

আসাদুল ইসলাম

উমর আলি। মেডিকেলে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক ৩২।

এখনও ৭২ শতাংশ গ্রামীণ ভারতবাসীর জীবন কৃষিনির্ভর। ভারতীয় অর্থনীতিও দাঁড়িয়ে আছে, আজও, কৃষি ব্যবস্থার ওপর। ফসল ফলানোর কর্মযজ্ঞ যাঁদের জীবন জুড়ে আছে, তাঁদের কাছে ফসল তোলার সময়টুকু শুধু আনন্দঘন হয়ে ওঠে, তা-ই নয়— তারচেয়ে আরও বেশি কিছু। যেন উৎসব-সমান। আল-আমীন মিশনের মতো যেসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেধাচাষের কাজে যুক্ত আছে, তাদের নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন হয় না ঠিকই, কিন্তু ফসল ঘরে তোলার অপার আনন্দের অনুভূতি হয় সারা বছর চেয়ে থাকা ওই কৃষকটির মতোই। বীজ বপন থেকে ফলবতী হয়ে ওঠার প্রতিটি স্তর ছুঁয়ে থাকার আনন্দ, আর একটি ছোট্ট পড়ুয়া-শিশুকে পাঁচ-সাত বছর ধরে যথাযথ পথনির্দেশ দিয়ে জীবনযুদ্ধের সফল সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আনন্দ— এই দুই আনন্দের অনুভূতি ঠিক কেমন, তা বাইরের কারো পক্ষেই আন্দাজ করা কঠিন। আনন্দ ভাগ করে নিলে নাকি বাড়ে। তাহলে আসুন, আল-আমীন মিশন নামক পশ্চিমবঙ্গের উর্বরতম মেধাচাষের মাটিতে এ-বছর যে-ফসল ফলল, তার গুণগত মান-পরিমাণ জেনে নিয়ে আনন্দের অংশীদার হই।

দেশভাগের পর এ-বাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজে সবচেয়ে বড়ো এবং ফলপ্রসূ উদ্যোগের নাম আবাসিক শিক্ষা আন্দোলন, যে-আন্দোলনের পথিকৃৎ আল-আমীন মিশন। আল-আমীন মিশনের পথ অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে পঞ্চাশেরও বেশি মিশন পরিচালিত হচ্ছে। আল-আমীন মিশন এককভাবে একটি মিশনের নাম হলেও, বর্তমানে মিশনের একচল্লিশটি শাখা। শুধু ব্যাপ্তিতে নয়, পরীক্ষার ফলাফলেও আল-আমীন মিশন বাকি অনুসারী মিশনগুলির সম্মিলিত সাফল্যের চেয়েও অনেক এগিয়ে। আল-আমীনের ফলাফলের বিশ্লেষণের সময় সে-দিকটা দেখে নেওয়া যাবে। কিন্তু এ-বিষয়টা বড়োকথা নয়, বড়োকথা হল, আল-আমীন মিশন একটি জাতিকে গহিন আঁধার থেকে আলোর আঙিনায় তুলে আনতে যে-আদর্শ সামনে রেখে আটাশ বছর আগে বিশেষ কর্মপদ্ধতি চালু করেছিল, সেই একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে একই আদর্শে পদচারণা শুরু করেছে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আল-আমীন মিশনের স্বপ্নকেই সফল করার কাজে সহযোগী এরা। আল-আমীন মিশনের এখানেই সন্তুষ্টি। আল-আমীন মিশনের এ-বছরের রেজাল্টের বিশ্লেষণেই স্পষ্ট হবে, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজে কত বড়ো সামাজিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে নিঃশব্দে।

আল-আমীন মিশন ছাড়া প্রথম সারির অন্য চোদ্দোটি মিশনের এ-বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল হাতে পেয়েছি আমরা (আরও দু-একটি মিশন হয়তো আছে, কিন্তু তাদের ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ওই চোদ্দোটি মিশনের বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের সম্মিলিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি। অপর দিকে আল-আমীন মিশনের কেবল বিজ্ঞান বিভাগ থেকেই এ-বছর পরীক্ষা দিয়েছিল তেরো-শো চৌষট্টি জন। সামাজিক পরিবর্তনের ছবি তুলে ধরার ক্ষেত্রে সমস্ত মিশনের ফল বিশ্লেষণ তো অনেক পরের কথা, কেবল

সবাই সেরা

আল-আমীনের ফলেরই খুব কম অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যাবে। শুধু উচ্চমাধ্যমিক হলে তাও কথা ছিল, সঙ্গে আছে মাধ্যমিক এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রেজাল্টও। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা জয়েন্ট— তিনটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে। এই তিন পরীক্ষার যেকোনো একটির ভালো ফল একজন পড়ুয়ার জীবনে তো বটেই, তার গোটা পরিবারের ওপর, যে-পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে আসছে পশ্চাৎপদতার অভিশাপ, সেখানে ফেলতে পারে আশার আলো। ওই তিন পরীক্ষা মিলে এ-বছর তেইশ-শোর বেশি ছেলেমেয়ে ভালো ফল করে আলোকস্নাত হয়েছে আল-আমীন মিশনের হাত ধরে। আল-আমীন মিশনের সঙ্গেই আমরা যারা স্বপ্ন দেখি জাতির ঘুরে দাঁড়ানোর, আসুন, এবার আলোকের ঝরনাধারায় অবগাহন করি।

শুরু করি জয়েন্ট পরীক্ষার ফল দিয়ে। রাজ্যে এবার, ২০১৪ সালে, প্রায় চৌষট্টি হাজার জন জয়েন্ট মেডিকেল এবং এক লক্ষ সতেরো হাজার জন জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে মেডিকেলে মাত্র চার হাজার চার-শো তেত্তিরিশ জনের র‍্যাঙ্ক ঘোষণা হয়। আঠারো-শো র‍্যাঙ্কের মধ্যে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা। এই আঠারো-শোর মধ্যে আল-আমীন মিশনের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক-শো একষট্টি জন। এর মধ্যে ছাত্রী তেইশ জন। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভর্তির পরীক্ষায় অনেক দূর পর্যন্ত র‍্যাঙ্ক ঘোষণা হলেও, পনেরো হাজারের মধ্যে র‍্যাঙ্কাররা ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এই পনেরো হাজার র‍্যাঙ্কের মধ্যে আল-আমীন মিশনের ছাত্রছাত্রী এক-শো আটান্ন জন। আর দশ হাজারের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে এক-শো বারো জন ছাত্রছাত্রী।

এ-বছর যারা সফল হল, যাদের জীবন বদলে গেল আল-আমীনের ছোঁয়ায়, তাদের কয়েক জনের জীবনকেও আমরা ছুঁয়ে যাব, যাতে সমাজ-বদলের ছবি কিছুটা হলেও ধরা পড়বে আমাদের চোখে। মিশনের এ-বছরের সফল তারকাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরে আছে উমর আলি। মেডিকেলের চৌষট্টি হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের প্রায় সাড়ে আট হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছে যে এখন আদর্শ ছাত্র। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার নতুনপাড়া গ্রামে বাড়ি উমরদের। আব্বা ঘরামি। উমরের মা সংসার সামলে বাকি সময় বিড়ি বাঁধেন অনটনের সংসারে সহায়তা দিতে। ২০১১ সালে উমর আল-আমীনের পাঁচুড় শাখায় ভর্তি হওয়ার পর, আল-আমীনের উজ্জ্বল প্রাক্তনীদের শূন্য থেকে শীর্ষ ছোঁয়ার গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন পরিবারের সকলে। উমরের এই সাফল্য শুধু ওর পরিবারকে বা আল-আমীন মিশন পরিবারকেই আলোকিত করেনি, আলোকিত করেছে গোটা সমাজকেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সামগ্রিক সমাজের যে নিম্নবিত্ত বলয়, সেই বলয়ের স্বপ্নহীন মানুষদের বুকে স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছে উমর।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আমডাঙা থানার রাহানা গ্রামের সাজিদ আহমেদ মেডিকেলে ৩৩ র‍্যাঙ্ক করেছে। সাজিদের আব্বা মহম্মদ ফিরদাউস মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। চাষবাস করেন। ছোটো একটি মুদিখানা সম্প্রতি চালু করেছেন। মা রহিমা খাতুন প্যারাটিচার। এক ছেলে এক মেয়েকে মানুষ করার বাসনা নিয়ে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেছেন। সাজিদ ২০১২ সালে পাঁচুড় শাখায় ভর্তি হয়। ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮১.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। এক বছর আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলে জয়েন্ট কোচিং নিয়ে এমন চমকপ্রদ ফল করেছে সাজিদ। আব্বা-মায়ের পেশা দেখেই বোঝা যায়, স্বচ্ছল পরিবার বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু নয়, কোনো রকমে চলে যায়। দুই সন্তানকে মানুষ করার বাসনার মাঝে বাধার প্রাচীর অর্থ। সে প্রাচীর টপকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হাত ধরেছে আল-আমীন মিশন। অর্ধেক ছাড়ে পড়াশোনা করার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাজিদ মুখ আলো করেছে সকলের।

> **আল-আমীন মিশনের এ-বছরের রেজাল্টের বিশ্লেষণেই স্পষ্ট হবে, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজে কত বড়ো সামাজিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে নিঃশব্দে।**

সাজিদ আহমেদ। মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক ৩৩।

ইনজামামুল হক। মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক ৩৪।

এর পরের র‍্যাঙ্ক ৩৪। আশ্চর্যজনকভাবে ৩২, ৩৩, ৩৪— পর পর তিনটি র‍্যাঙ্কই আল-আমীন মিশনের। ৩৪ র‍্যাঙ্ক করেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন পাড়ার ইনজামামুল হক। ইনজামামুলের আব্বা মহম্মদ ঈশা প্রাইমারি শিক্ষক। মা সৌকেতারা খাতুন আইসিডিএস কর্মী। দু-বোনকে নিয়ে পাঁচ জনের সংসার। ইনজামামুল ক্লাস এইটে আল-আমীনের দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলপুকুর শাখায় ভর্তি হয়েছিল। ২০১১ সালে মাধ্যমিকে ৭১৪ (৮৯.২৫ শতাংশ) নম্বর পেয়েছিল। খলতপুর শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৮২.৬ শতাংশ নম্বর। ইনজামামুলদের মতো আর্থিক সংগতিসম্পন্ন পরিবার ছাড় পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ওর বড়োবোন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বি-টেক পড়ে, সেই খরচের কথা ভেবে মিশন সামান্য হলেও ছাড় দিয়েছিল। বেছে বেছে নয়, প্রথম তিনজনের কথা জানালাম।

পঞ্চাশের মধ্যে র‍্যাঙ্কার জোহেব মণ্ডল (৩৮ র‍্যাঙ্ক) মহম্মদ সাজিদ মল্লিকের (৪০ র‍্যাঙ্ক) কথা জানাতে পারলেও ভালো লাগত। ৫১ র‍্যাঙ্কার সাহারুখ হোসেনের কথা 'আল-আমীন বার্তা'র নিয়মিত পাঠকরা অবশ্যই পড়েছেন, এই সংখ্যার ঠিক আগের সংখ্যায়। তার সাক্ষাৎকার 'শিখরদেশ' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। সাহারুখ সম্পর্কে এখানে শুধু একটা কথা স্মরণ করাই, ওই সাক্ষাৎকারে তাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, 'যদি ডাক্তার না হতে পার?' সাহারুখ উত্তর দিয়েছিল, 'ডাক্তারই হব।' কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে স্পর্ধার সঙ্গে এ-কথা বলা যায়, তা ভেবে দেখার বিষয়। আল-আমীন মিশন এই আত্মবিশ্বাসের বীজ ছেলেমেয়েদের মনে বপন করে দেয়।

এবার মেডিকেলে সফল মেয়েদের কথা বলি। যে তেইশ জন মেয়ে এবার আল-আমীন মিশন থেকে ডাক্তারি পড়তে যাবে, তাদের মধ্যে থেকে দু-জন এক-শোর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে। প্রত্যেকের সাফল্যের কথা বলতে গেলে পৃথক একটা বই-ই হয়তো লিখতে হবে। ৮২ র‍্যাঙ্ককার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেহজাবীন পারভিনের চেয়ে অনেক আগের র‍্যাঙ্কার তাবাসসুম খাতুন, তার কথা উল্লেখ করার দাবি রাখে। তাবাসসুম এ-বছর মেডিকেলে ৫৮ র‍্যাঙ্ক করেছে। তাবাসসুমের বাড়ি হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার কুমিরমোড়া গ্রামে। আব্বা সেখ সাবির আলি মানসিক ভারসাম্যহীন। মা আনজুমানতারা বেগম তিন মেয়েকে কীভাবে মানুষ করবেন! মামা-চাচাদের সহায়তাই সম্বল তিন বোনের। গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনের মেমারি শাখায় ভর্তি হয়েছিল তাবাসসুম। উচ্চমাধ্যমিকে ৮৭.১ শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। প্রতি বছর আল-আমীন মিশন শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করার রেকর্ড করে। দেখা যায়, পরের বছর সেই রেকর্ড আল-আমীনই ভেঙে দিয়ে নতুন করে এগিয়ে যাচ্ছে। রেজাল্ট বের হওয়ার পর উজ্জ্বল সফল ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারভিউ টিভি চ্যানেলে দেখানো এখন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওইসব চ্যানেলে যেসব ছেলেমেয়েরা যায়, দেখা যাচ্ছে, তাদের কেউ কেউ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করার সুবাদে আগেও টিভির পর্দায় বক্তব্য রেখেছে। গোটা বিশ্বের দরবারে আল-আমীনের ছেলেমেয়েরা উজ্জীবনের কথা শোনায়। তাবাসসুম সেরকম একজন। তাবাসসুম উচ্চমাধ্যমিকের পর মেডিকেলেও ভালো র‍্যাঙ্ক করে এ-বছর টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়েছিল আল-আমীনের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। অনেক কথা বলার পর উপস্থাপিকা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একে তো অনগ্রসর সমাজের প্রতিনিধি, তার ওপর মেয়ে, তাই বাড়তি কোনো সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি? তাবাসসুম বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছিল, আল্লাহ্ আমাকে মেয়ে না করলে, আমাদের পরিবারের যে আর্থিক অবস্থা, হয়তো আমাকে উপার্জনে লেগে পড়তে হত, মেয়ে বলেই পড়ার সুযোগ মিলল বলে মনে করি।

আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঠিক একই রকমের কথা বলেছিল, ওই অনুষ্ঠানেই, জোহেব মণ্ডল, যে আবার তাবাসসুমের মতোই মামাদের সহযোগিতা নিয়ে পড়াশোনা করেছে আল-আমীনে আসার আগে অবধি। মেডিকেলে ৩৮ র‍্যাঙ্ক করলেও, ওর কথা জানানোর সুযোগ আমরা এখানে পেলাম না। প্রশ্ন হল, এমন সমঝদারি, এমন ভাবনার রসদ ওরা কোথা থেকে পেল? এর পিছনে কি আল-আমীনের বিশেষ ভূমিকা আছে? এ-প্রশ্নের উত্তর তত ভালোভাবে কেউ দিতে পারবেন না, যাঁরা এইসব ছাত্রছাত্রীদের আল-আমীনে আসার সময় এবং আল-আমীনে পড়াশোনা করে বের হওয়ার সময়— এই দুটো সময়কে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা ছাড়া। মেডিকেলে আড়াই হাজারের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করা দু-শো চোদ্দো জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১০০ র‍্যাঙ্কের মধ্যে প্রথম দিককার কয়েক জনের কথা জানালাম। বাকি দু-শোরও বেশি ছাত্রছাত্রীর জীবনে এমন লড়াই আছে, যা আমাদের বাক্‌হীন করে দেবে, তাদের কথা আমরা তুলে ধরতে পারলাম না, লেখাটা অত্যন্ত বড়ো হয়ে যাবে এই আশঙ্কা করে।

এবার আমরা জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভালো র‍্যাঙ্ক করা কয়েক জনের

মিশনের এ-বছরের সফল তারকাদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিখরে আছে উমর আলি। মেডিকেলের চৌষট্টি হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছে যে এখন আদর্শ ছাত্র।

তাবাসসুম খাতুন। মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক ৫৮।

মেহজাবীন পারভিন।
মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক ৮২।

রুনা লায়লা।
মেডি. র‍্যাঙ্ক ১১২।

নিশা খাতুন।
মেডি. র‍্যাঙ্ক ১১৫।

কথা বলব। এদের কথা বলার আগে, একটা কথা এ-বিষয়ে ছোটো করে বলে নেওয়া দরকার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ঝোঁকটা অনেকটাই নির্ভর করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে চাকরির বাজার কতটা প্রসারিত-সংকুচিত হচ্ছে, তার ওপর। ডাক্তারি যেহেতু নিশ্চিত সাফল্যের পথ, তাই ইদানীং ছাত্রছাত্রীদের ঝোঁক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তুলনায় ডাক্তারির দিকেই বেশি দেখা যাচ্ছে। গতবছর পর্যন্ত দেখা গেছে, মিশন থেকে মোট ন-শো পঁয়ষট্টি জন মেডিকেল পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আর এ-বছর এক-শো ষাট জনের মতো। অন্যদিকে গতবছর পর্যন্ত পনেরো-শো পঁচানব্বই জন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল, এ-বছর পাবে এক-শো ষাটেরও বেশি। এদের মধ্যে ৫৯৯ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছে তারিক আহমেদ। তারিকদের বাড়ি বীরভূম জেলার মুরারই থানার কাশিমনগর গ্রামে। তারিকের আব্বা খায়রুল আলম ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন। দিনমজুরি করে সংসার চালান। মা জরিনা বিবিরও পড়াশোনা ওই ক্লাস ফাইভ। তারিকরা চার ভাই চার বোন। তারিক আব্বা-মার ষষ্ঠ সন্তান। পরিবারে উচ্চশিক্ষিত বলতে এক দিদি বিএ পড়েছেন। তারিকদের আত্মীয়পরিজনদের মধ্যেও একমাত্র তারিকই সম্মানজনক কোনো পেশায় পা বাড়াতে চলেছে। তারিক ২০০৯ সালে আল-আমীনের ধুলিয়ান শাখায় ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়। ২০১১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। ওই বছর ধুলিয়ান শাখার সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৮৯.৫ শতাংশ। আর আল-আমীন মিশনের সব শাখা মিলিয়ে যে প্রথম হয়েছিল, সে পেয়েছিল ৯১.৫ শতাংশ নম্বর। তারিক গতবছর আল-আমীনের পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৭৭.৬ শতাংশ নম্বর। এরপর আল-আমীন মিশন থেকেই জয়েন্টে কোচিং নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫৯৯ র‍্যাঙ্ক করেছে। তারিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। আল-আমীন মিশন থেকে এখন যারা ভালো রেজাল্ট করছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে যে, অনেকেরই পাড়ার বা পাশের গ্রামের চেনাজানা কেউ আল-আমীন মিশন থেকে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন দেখা যাচ্ছে, তারিকদের গ্রামের মেয়ে তাহেরা খাতুন আল-আমীন থেকে ডাক্তার হয়েছে। আর তাহেরার পরিজনদের মধ্যে তিনজন ডাক্তার হয়েছেন আল-আমীনের হাত ধরে। এই ছবি থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, একজন সফল পড়ুয়ার সাফল্য শুধু তার পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকেই নয়, পাশের গ্রামের মেধাবান ছাত্রছাত্রীদের পরোক্ষভাবে হলেও অনেকখানি প্রভাবিত করতে পারে। ভূমিহীন দিনমজুর পরিবারের সন্তান তারিকও যে আল-আমীন মিশনে সম্পূর্ণ বিনা-বেতনে পড়াশোনা করে এমন চমকপ্রদ সাফল্য পেল, হয়তো তার এই সাফল্য অন্য কোনো তারিককে পড়াশোনায় মনোযোগী করে তুলতে সাহায্য করবে। সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে ঘটতে থাকা এই পরিবর্তনকে পরখ করতে হলে একটু গভীরভাবে তলিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে পারলে আল-আমীন মিশন আন্দোলনের প্রভাব খানিকটা আঁচ করা যেতে পারে।

এবার আসা যাক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, রাজ্য স্তরে ৮২১ র‍্যাঙ্কার মহম্মদ হাসেম আলির কথায়। হাসেমের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার নতুনপাড়া গ্রামে। হাসেমের আব্বা মহম্মদ রওশন আলি মারা গেছেন ২০০৭ সালে। পড়াশোনা জানতেন না। চাষবাস করতেন। মা ওছেদা বেওয়াও নিরক্ষর। চার ভাই ও তিন বোনের সংসার। সাত সন্তানের চার জন অষ্টম শ্রেণির চৌকাঠ পার হতে পারেননি। এক বোন উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত, এক ভাই পাস কোর্সে বিএ দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়ে আর পড়েননি। গন্ডি ছাড়িয়ে এগিয়েছে শুধু হাসেম। এ-বছর মেডিকেলে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কার উমর আলি আর হাসেম গ্রামের একই স্কুলে পড়ত, সহপাঠী। মিশনেও ভর্তি হয়েছিল একই সঙ্গে। গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করার পর একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখায় ভর্তি হয়। ওই শাখা থেকে পরীক্ষা দিয়ে হাসেম উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। এক বছর জয়েন্ট কোচিং নেওয়ার পর, এ-বছর পরীক্ষা দিয়ে হাসেম ৮২১ র‍্যাঙ্ক করেছে। বড়োভাইয়েরা কষ্ট করে চাষবাস করে সংসার চালান। আর্থিক সহায়তা নিয়ে হাসেমের পাশে দাঁড়িয়েছে মিশন। তিন বছরের পড়াশোনায় এক-চতুর্থাংশেরও কম বেতনে পড়াশোনা করেছে হাসেম। আজ যে হাসেম কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাইছে, তা কি সম্ভব হত আল-আমীন না থাকলে? হাসেমের অভিভাবক, বড়োভাই, সুরহাক আলি জানান, সেটা কোনোদিনই হয়তো সম্ভব হত না।

রাজ্য স্তরে জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ১০৫১ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে আবু তাহির। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার দরগাপাড়া গ্রামে বাড়ি তাহিরদের। বাবা কুরবান আলি বিএ পাস, চালের খুচরো ব্যাবসা করেন। চাষবাসও আছে। মা সারিদা বেগমের পড়াশোনা উচ্চমাধ্যমিক। গৃহবধূ। তাহিররা তিন ভাই এক বোন। তাহির বড়ো। পরের জনও ভাই, আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পড়ছে। তাহির মিশনে ভর্তি হয়েছিল ২০১১ সালে, পাঁচুড় শাখায়। গতবছর

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫৯৯ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছে তারিক আহমেদ। তারিকদের বাড়ি বীরভূম জেলার মুরারই থানার কাশিমনগর গ্রামে। আব্বা খায়রুল আলম ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন। দিনমজুরি করে সংসার চালান। মা জরিনা বিবিরও পড়াশোনা ওই ক্লাস ফাইভ।

১. মহ. হাসেম আলি। ইঞ্জি. র‍্যাঙ্ক ৮২১।
২. আবু তাহির। ইঞ্জি. র‍্যাঙ্ক ১০৫১।
৩. সেরু মোমিন। ইঞ্জি. র‍্যাঙ্ক ১২৩০।

উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ৮০.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে। ওই বছরে, রানিং স্টুডেন্ট হিসেবে জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৫৭৪১ র‍্যাঙ্ক করেছিল। আরও ভালো র‍্যাঙ্ক করে ভালো কলেজে পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে ভর্তি না হয়ে আল-আমীন থেকেই এক বছরের কোচিং নেয়। এ-বছর ১০৫১ র‍্যাঙ্ক করে তাহির সিভিল বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়বে ভাবছে। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান তাহির এক চতুর্থাংশেরও কম বেতনে পড়াশোনা করেছে। তাহির ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলেও, সে চায়, মিশনে পাঠরত তার ভাই ডাক্তার হোক। যেমন তাদের পাশের গ্রামের একজন এখন আল-আমীন মিশন থেকে পাস করে এনআরএসে ডাক্তারি পড়ছে। আর এ-বছরই আল-আমীন থেকে মেডিকেলে ৯৫ র‍্যাঙ্কার মতিউর রহমান শুধু সহপাঠীই নয়, পাশের গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামের ছাত্র। এক সময় সংখ্যালঘু সমাজে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর দিকে, তাদের পরিবারের দিকে, সংখ্যাল্পতার কারণে, মানুষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাত। কিন্তু আজ বহু গ্রামেই একাধিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শুধু নয়, বহু পরিবারেই একাধিক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে পাওয়া যাবে। আজও রাজ্যের সেরা মেধাবানদের জায়গা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটা আজকের দিনে সংখ্যালঘু সমাজের কাছে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। একটা কঠিন জায়গাতে সহজেই পৌঁছোনো সম্ভব, গোটা একটা সমাজের এই যে দৃষ্টিভঙ্গির বদল, এর পিছনে গোটা রাজ্যে যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অবদান থাকে, তাহলে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে হবে, তার নাম আল-আমীন মিশন।

রাজ্যে শিক্ষাবিকাশের কাজে আল-আমীন মিশন সব সময় নতুন ভাবনা, নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আরও কী কী পদক্ষেপ নিলে সমাজ বেশি উপকৃত হবে, এই ভাবনাতেই চালিত হচ্ছে আল-আমীনের কর্মকাণ্ড। এই যেমন উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে। সফল জীবনে প্রবেশ করার বা কোনো ভালো কোর্সে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে, সকলেই জানি, উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট একটা বড়ো ব্যাপার। এই কথা মাথায় রেখে, আল-আমীন মিশন গত কয়েক বছরে বিভিন্ন শাখা থেকে সর্বাধিক সংখ্যক পড়ুয়াকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সেই কারণেই অনেকটা করে বাড়ছে। যেমন গতবছর আল-আমীনের বিভিন্ন শাখার এগারোটি বয়েজ ক্যাম্পাস ও চারটি গার্লস ক্যাম্পাস মিলে মোট ন-শো একুশ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। আর এ-বছর সেখানে প্রায় পাঁচ-শো জন ছাত্রছাত্রী বেশি পরীক্ষা দিয়েছে। এ-বছর বালক ও বালিকা বিভাগে তিনটি করে নতুন শাখার ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে। এ-বছর চোদ্দোটি শাখার ছাত্র ও সাতটি শাখার ছাত্রী মিলে মোট তেরো-শো উননব্বই জন পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় সবটাই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী। দু-জন ছাত্র ও পঁচিশ জন ছাত্রী মিলে মাত্র সাতাশ জন ছাত্রছাত্রী কলা বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিল। এই তেরো-শো উননব্বই জনের মধ্যে বারো-শো ছিয়াত্তর জনই প্রথম বিভাগ ও তার বেশি নম্বর পেয়েছে। আর স্টার মার্কস অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ছ-শো চুয়াল্লিশ জন। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৯২-৯৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে বা তার বেশি নম্বর নিয়ে পাস করছে, ভাবা যায়! আবার বিশ-পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী হলে এই মান ধরে রাখাটা অবাক হওয়ার মতো ছিল না। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার! এবং আরও বড়ো বিষয় হল, এইসব পরীক্ষার্থীর বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের, যাদের সামনে হাজার রকমের প্রতিকূলতা। আল-আমীন মিশন আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এইসব ছাত্রছাত্রীর পাশে দাঁড়ায়, শুধু এটুকু ভাবলে ভুল হবে। আল-আমীন মিশন আরও বড়ো যে-সহায়তা দেয়, তা হল মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো। কোনো বাধাই বাধা নয়, এই চেতনাকে সম্বল করে, এই দুর্দান্ত ফল সম্ভব হচ্ছে। এবার দু-একজন পরীক্ষার্থীর সাফল্যের কথা বলা যাক। এ-বছর ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে এগারো জন ছাত্রছাত্রী। প্রায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে তেরো-শো উননব্বই জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে জিশান সওকত মিদ্যা ও ইনজামুল হক। বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। দুজনের মধ্যে একজনের কথা উল্লেখ করি। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার সাহাপুর গ্রামে বাড়ি জিশানদের। আল-আমীন মিশনের প্রধান শাখা খলতপুর থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। আর-একটা তথ্য, জিশানের এক দাদাও আল-আমীন মিশন থেকে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছেন। আল-আমীন মিশন যে সমাজের মানুষের কাছে আশাতীত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তার প্রমাণ আমরা পাই, যখন দেখি, একই পরিবারের একাধিক সন্তান মিশনে ভর্তি হচ্ছে। ভালো পড়াশোনার সুযোগ প্রিয় সন্তানরা বা ভাইবোনেরাও একইভাবে পেয়ে বিকশিত হোক, এই ভাবনা থেকেই যে এই ঝোঁক, তা স্পষ্ট। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ফাঁকিবাজি থাকলে এই প্রবণতা দেখা যেত না। মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে বর্ধমানের বামুনারি গ্রামের সেখ মহম্মদ আসিফ। জিশানদের চেয়ে সে মাত্র ২ নম্বর কম পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫৭। সামান্য চাষবাসের আয় থেকে সংসার চলে আসিফদের। কৃষকপরিবারের এমন সন্তানদের পাশে যে

পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে পরীক্ষা দিয়ে হাসেম উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। এক বছর জয়েন্ট কোচিং নেওয়ার পর, এ-বছর পরীক্ষা দিয়ে হাসেম ৮২১ র‍্যাঙ্ক করেছে। বড়োভাইয়েরা কষ্ট করে চাষবাস করে সংসার চালান। আর্থিক সহায়তা নিয়ে হাসেমের পাশে দাঁড়িয়েছে মিশন।

জিশান সওকত। উচ্চমাধ্যমিকে যুগ্ম সর্বোচ্চ ৪৫৯।

ইনজামুল হক। উচ্চমাধ্যমিকে যুগ্ম সর্বোচ্চ ৪৫৯।

আল-আমীন মিশন সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়াবে, সে-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে সাতটি বালিকা শাখার চার-শো উনপঞ্চাশ জন ছাত্রীর মধ্যে সবার ওপরে আছে খলতপুর শাখার ফাহিমা আক্তার। আর ছাত্রছাত্রী মিলে তেরো-শো উননব্বই জনের মধ্যে ফাহিমা নবম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৫০। ফাহিমার আব্বা পেশায় পার্শ্বশিক্ষক। ফাহিমা ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে আল-আমীন মিশনে কোচিং নেওয়া শুরু করেছে। আরও দু-একজনের কথা এক লাইন করে বলা যায়। যেমন নাসিম চৌধুরী। সেই ক্লাস ফোর থেকে দেখে আসছে, পরিবারের প্রধান, তার আব্বা অসুস্থ। পিতা অনেক আশা নিয়ে ভর্তি করেছিলেন মিশনে। নাসিমকে এতিম করে দিয়ে তার আব্বা আলম চৌধুরী এ-বছরই মারা গেছেন। ৮৫ শতাংশের বেশি নম্বর নিয়ে নাসিমের পাশ করে যাওয়া তিনি দেখে যেতে পারেননি। নাসিমের অসুস্থ আব্বা জানতেন, নিজের কেউ চিকিৎসক হলে কতটা বদলে যেতে পারত তাঁর অসুস্থ জীবন। আব্বার চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে নাসিম ডাক্তার হতে চায় এখন। বর্ধমান জেলার ভাতার থানার বানেশ্বরপুরে মেহেরুন্নেসার বাড়ি হলেও, আমাদের আশেপাশেও চোখ মেলে তাকালে এমন মেহেরুন্নেসার দেখা পাব। মেহেরুন্নেসা আব্বাকে হারিয়েছে অনেক আগেই। মা হাফসা বেগমের শত দুঃখের মাঝেও সান্ত্বনা মেয়ের অত্যন্ত ভালো ফল করাটুকু। আল-আমীন মিশনের মেমারি শাখা থেকে পরীক্ষা দিয়ে মেহেরুন্নেসা পেয়েছে ৪৩২, অর্থাৎ ৮৬.৭ শতাংশ নম্বর। মেহেরুন্নেসাকে নিয়ে এই একই নম্বর পেয়েছে পাঁচ জন। এদের একজন এরসাদ আলি। এরসাদের আব্বা-মার পড়াশোনা

১. সেখ মহ. আসিফ। উ.মা. ৪৫৭।
২. নাসের উল ইসলাম। উ.মা. ৪৫৪।
৩. ফাহিমা আক্তার। উ.মা. ৪৫০।
৪. হাজেকুল হাসনাত। উ.মা. ৪৫৪।
৫. মহ. ফইজুল আহমেদ। উ.মা. ৪৫২।

নামমাত্র হলেও, ছেলে ডাক্তার হওয়ার স্পর্ধা দেখাচ্ছে এখন। সংখ্যালঘু সমাজের বেশির ভাগ বাবা-মা কম পড়াশোনা জানলেও, সবাই কিন্তু তা নয়। কেউ কেউ পড়াশোনা জানলেও সম্মানজনক পেশায় আসার যোগ্যতা থাকলেও, আর্থসামাজিক নানা কারণে আসতে পারেননি। এই যেমন, এবার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৮৩ শতাংশ নম্বর পাওয়া নাহিদ জাসমিনের আব্বা-মা দুজনেই গ্র্যাজুয়েট। আব্বা মুদিখানা দোকান চালান। তিনি আল-আমীনকে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা অভিশাপের হাত থেকে পরের প্রজন্মকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাহাদুরপুর গ্রামের এই পরিবারটির স্বপ্ন আজ বাংলার ষাট লক্ষ সংখ্যালঘু পরিবারেরও নয় কি? কথায় কথায় এই নিবন্ধটির জন্য

এখন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ফল বের হলে রাজ্যের মানুষ খোঁজ নেয়— প্রথম দশ জনের মধ্যে আল-আমীনের কেউ নেই? প্রতিবার ফল বের হলে দেখা যায়, যে প্রথম হচ্ছে, তার সঙ্গে আল-আমীন মিশনের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের প্রাপ্ত নম্বরের ফারাক মাত্র ১০ থেকে ১৫-র মধ্যে।

বরাদ্দকৃত শব্দ সংখ্যা কমে যাচ্ছে কীভাবে, খেয়ালই হচ্ছে না। এবার বাড়তি শব্দ খরচ না করে মাধ্যমিকের রেজাল্টে চলে আসি।

এ-বছর মিশনের ন-টি বালক ক্যাম্পাস ও চারটি বালিকা ক্যাম্পাস থেকে মোট ছ-শো চোদ্দো জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে বালক চার-শো চব্বিশ জন ও বালিকা এক-শো নব্বই জন। এই ছ-শো চোদ্দো জনের মধ্যে ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে এক-শো দশ জন ছাত্রছাত্রী। ৮৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে প্রায় অর্ধেক ছাত্রছাত্রী, দু-শো একানব্বই জন। স্টার মার্কস ও তারচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ-শো দু-জন। অর্থাৎ, মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর ৮২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্টার মার্কস পেয়ে পাস করেছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটি কি গৌরবের নয়? এবং এটাও কি কম গৌরবের যে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেখানে ছ-শো চোদ্দো জন, তাদের মধ্যে প্রথম বিভাগ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে পাঁচ-শো ছিয়ানব্বই জন!

এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশনের ছ-শো চোদ্দো জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম হয়েছে রিজিয়া সুলতানা। শুধু মিশনের মধ্যেই নয়, গোটা রাজ্যে যে সাড়ে দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সম্ভাব্য ত্রয়োদশ স্থান রিজিয়ার। রিজিয়া পেয়েছে ৬৭০ নম্বর। গত বছর প্রথম হওয়া শরিয়তুল্লাহ পেয়েছিল ৬৬৬ নম্বর। এখন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ফল বের হলে রাজ্যের মানুষ খোঁজ নেয়— প্রথম দশ জনের মধ্যে আল-আমীনের কেউ নেই? প্রতিবার ফল বের হলে দেখা যায়, যে প্রথম হচ্ছে, তার সঙ্গে আল-আমীন মিশনের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের প্রাপ্ত নম্বরের ফারাক মাত্র ১০ থেকে ১৫-র মধ্যে। মাধ্যমিকে একবার প্রথম হয়ে আল-আমীন দেখিয়েছে,

রিজিয়া সুলতানা। মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ ৬৭০।

এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশনের ছ-শো চোদ্দো জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম হয়েছে রিজিয়া সুলতানা। শুধু মিশনের মধ্যেই নয়, গোটা রাজ্যে যে সাড়ে দশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সম্ভাব্য ত্রয়োদশ স্থান রিজিয়ার। রিজিয়া পেয়েছে ৬৭০ নম্বর।

ভবিষ্যতেও দেখাবে এমন আশা করাই যায়। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় যে, একদা প্রায় শিক্ষাবিমুখ ছিল যে-জাতি, তাদের প্রত্যাশা এখন কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে যে, সর্বোচ্চ শিখরে থাকতে চাইছে তারা! এবং এই প্রত্যাশাপূরণে আল-আমীন মিশনকেই তাদের স্বপ্নপ্রতিষ্ঠান মনে করছে। এ-বছর ৬৬৬ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে মাসুদ আল হাসান। মাসুদ আল-আমীনের ধুলিয়ান শাখা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। পিতৃহীন মাসুদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার ভাবতা গ্রামে। তৃতীয় স্থানটিও দখল করেছে মেয়েরা। ৬৬২ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছে মৌমিতা খাতুন। মৌমিতার চেয়ে ১ নম্বর কম পেয়ে চতুর্থ হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার আসিফ রেজা। এইসব ছাত্রছাত্রীদের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আর আলাদা করে উল্লেখ করলাম না। উল্লেখ করলে আগের মতো দেখা যেত, বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই নিম্নবিত্ত পরিবারের। অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া এবং আল-আমীন মিশনের আর্থিক সহায়তা আর পথপ্রদর্শন তাদের জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এই আলোকমুখী অভিযান এককথায় বলা যায় অবিশ্বাস্য। মাত্র পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে মানুষের জীবন বদলের শত শত উদাহরণ তৈরি করতে পেরেছে আল-আমীন মিশন। এক সময় যেসব ছেলেমেয়ে বা তার অভিভাবকদের চোখে-মুখে লেগে থাকত অসহায়তার ছাপ, তারাই ওই পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে শুধু যে বিত্ত-বৈভবের জীবনে প্রবেশ করছে তাই-ই নয়, অন্যদের দিকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে সহমর্মী হাত। এ-কথা তো দিনের আলোর মতো সত্য যে, সমাজের মানুষের দান-জাকাতের অর্থেই আল-আমীনের গড়ে ওঠা। দুঃস্থ-মেধাবীদের লালনও ওই অর্থের আনুকূল্যে। আল-আমীন মিশন করে দেখিয়েছে যে, সঠিকভাবে মেধার লালন করতে পারলে, যেসব হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এক সময় জাকাতের অর্থে পড়াশোনা করেছে, তারাই দ্রুত জাকাত প্রদান করে সমাজ-বিকাশের কাজকে ত্বরান্বিত করছে। সংখ্যালঘু সমাজের সমাজদরদী যেসব মানুষ উদারতার হাত প্রসারিত করেছেন, তাঁদের সন্তুষ্টি এই যে, তাঁদের দানের অর্থ সঠিক অর্থে কাজে লাগা বলতে যা বোঝায়, তাই-ই করে দেখিয়েছে আল-আমীন মিশন। দানের অর্থে কেউ খাদ্যদ্রব্য বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে ব্যবহার করে নিলে, তা একবারই ফল দেয়। কিন্তু ওই অর্থ শিক্ষা-বিকাশের কাজে লাগালে মানবসম্পদের মানোন্নয়ন ঘটে। ওই মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বস্তুগত সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়, যা পরোক্ষে সমাজোন্নয়নের কাজেই সহায়তা করে। এই মানবসম্পদ শুধু যে ব্যক্তিমানুষের, নির্দিষ্ট পরিবারের বা জাতিগোষ্ঠীর কাজে লাগে, তাই-ই নয়, দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল-আমীন মিশনের যেসব উজ্জ্বল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বা বিদেশে কর্মরত আছেন, তাঁদের প্রদত্ত পরিষেবা শুধু রাজ্য বা দেশের কাজে লাগছে, ভাবলে ভুল হবে, বরং তাঁদের কর্মকুশলতা দিয়ে, তাঁদের আবিষ্কার গবেষণা দিয়ে উপকৃত হচ্ছে গোটা মানবসমাজ। গ্লোবালাইজেশনের যুগে প্রতিটি মানুষ আজ বিশ্বনাগরিক। প্রত্যেকে তাঁদের পরিষেবা দিয়ে মানবজীবনকে আরও স্বচ্ছন্দ সুন্দর করার কাজে ব্যাপৃত আছেন। আল-আমীন মিশনের ছেলেমেয়েদের অনেকে হয়তো সরাসরি সমাজসেবার কাজের সঙ্গে যুক্ত নেই, কিন্তু তাঁদের মেধা শ্রম প্রযুক্তিগত কুশলতা থেকে উপকৃত হচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে যে এমন মহৎ কাজ সাধিত হচ্ছে, সেটা ভাবলেই অন্যরকম অনুভূতি হয়। আরও একটা কথা, এটা ঠিক যে, সমাজের মানুষের দানেই আল-আমীন মিশনের পথ-চলা শুরু, বেড়ে ওঠা। কিন্তু যেকোনো বৃহৎ কর্মযজ্ঞের সফল পদচারণার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সম্মিলন দরকার। বিশেষ করে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশকে অগ্রবর্তী করে তোলার প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে। কমিউনিটির উন্নতির জন্য কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন দরকার। সরকারের নানা প্রকল্প আছে, কিন্তু সেই প্রকল্প থেকে সুবিধা নেওয়ার মতো যোগ্য প্রতিষ্ঠান সংগঠনের অভাব যথেষ্ট। সরকারি প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের জন্য সরকারকে সমাজের মানুষের ওপরই নির্ভর করতে হয়। সার্বিক অংশগ্রহিতার অভাব ঘটলে সুবিধা থেকেও কোনো লাভ হয় না। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এটাই হয়ে এসেছে। বর্তমানে যেমন কন্যাশ্রী, ওবিসি সংরক্ষণ, প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের মতো নানা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে আলোচনা শুরু হয়েছে। এইসব প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণের জন্য সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করা জরুরি। আল-আমীন মিশনের মতো প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষ ও সরকারের মাঝে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে, সাধারণ মানুষের কাছে এইসব প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। সমাজহিতৈষী মানুষদের উদ্যোগ আর সরকারি উদ্যোগকে একত্রিত করে, সমাজ পরিবর্তনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আল-আমীন মিশন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে সমাজ-পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সমাজ-পরিবর্তনের ছবিটা কয়েক বছর আগেও স্পষ্টভাবে ধরা যেত না। কিন্তু আল-আমীন মিশনের এ-বছরের রেজাল্ট সেই অস্পষ্টতাকে মুছে দিয়েছে অনেকটাই। প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি ছাত্রছাত্রীর জীবন বদলে গেল আল-আমীন মিশনের ছোঁয়ায়। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় আড়াই হাজার ছেলেমেয়ের মুখের সারি আল-আমীন মিশন নামের যে-ক্যানভাসে ফুটে উঠল, সেখানে সমাজ-বদলের সংকেত এখন সুস্পষ্ট। ■

১. মাসুদ আল হাসান। মাধ্যমিকে ৬৬৬। ২. মৌমিতা খাতুন। মাধ্যমিকে ৬৬২। ৩. আসিফ রেজা। মাধ্যমিকে ৬৬১। ৪. মহ. ইবনুল হাসান। মাধ্যমিকে ৬৫৯। ৫. মহ. মুরসালিন মোল্লা। মাধ্যমিকে ৬৫৯। ৬. সালমান আলি খান। মাধ্যমিকে ৬৫৯।

আরবি আর-রামাদা (অর্থ বিশুষ্কতা অথবা প্রখর তাপ) শব্দ থেকে উদ্ভূত রামাদান, ফারসিতে যা রমজান। আরবি বছরের নবম মাস। এই বিশুষ্কতা ধর্ম-নির্দেশিত, যা দুনিয়ার মুসলমান এক মাস উপবাসের মাধ্যমে আন্তরিকভাবে শরীরে ও মনে ধারণ করে। সেই ত্যাগের কথা এই পাতায়।

রমজান ও বিজ্ঞান

মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম

মুসলমান সমাজে রমজানের এক আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। রমজান হিজরি সনের নবম মাস, মুসলমান সমাজে এর গুরুত্ব অপসিরীম। ধর্মপ্রাণ সমস্ত মুসলমানকে এই মাস ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, খালি-পেটে ধর্ম হয় না। কিন্তু ইসলাম এই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে। রমজানের রোজা কেবলমাত্র উপবাস নয়, এ একপ্রকারের অনুশীলন এবং অধ্যবসায়, যার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে চারটি— কালেমা, নামাজ, জাকাত ও হজ— ব্যক্তি তার নিজের জন্য পালন করে, কিন্তু রোজা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। রোজাদার ব্যক্তির ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অর্থ এবং সামর্থ্য সবই আছে, তা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে না, বরং চরমভাবে সংযম পালন করে থাকে। পাক কালামে আল্লাহ্ তাই বলেন, 'আস্সাউমি লী, ওয়া আনা আজজিবিহি' অর্থাৎ সাউম বা রোজা আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দেব। ইসলাম, জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ধর্ম নয়, তাই সন্ন্যাসজীবন ইসলামে অস্বীকৃত। হজরত মহম্মদ (স.) স্পষ্টতই বলেছেন, 'লা রুহ্‌বানিয়াতা ফিল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই। 'ইসলামো দ্বীনাও' অর্থাৎ ইসলাম দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থা (code of life)। মানুষ জগতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসে এবং ওই সময়ের মধ্যে জীবনধারণের জন্য সে কীরূপ আচরণ করবে, দ্বীন সে-সম্পর্কে নির্দেশ (guide line) দিয়েছে। ধর্ম এখানে সকাল-সন্ধ্যার কোনো ব্যাপার নয়, বরং সর্বক্ষণের সব মুহূর্তের। এখানে নিজের সুখ বা ইচ্ছাপূরণ বড়োকথা নয়, বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার (will of God) কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণই পরম লক্ষ্য। এখানে নিজের চেয়ে সবার মঙ্গলসাধন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রোজার মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়সাধন ঘটে রোজার করণীয় কার্যাবলির সাথে সাথে। রোজাদার ব্যক্তি সুবেহ সাদেক (সূর্য উদিত হওয়ার কিছু পূর্বে) থেকে গুরুবুস সামসে (সূর্য অস্তমিত যাওয়া) অবধি সর্বপ্রকার পানাহার ও ইন্দ্রিয়সুখ হতে বিরত থাকে, যার ফলে রোজাদার ব্যক্তি অভুক্ত থাকার সঙ্গে শুভ ও অশুভের পার্থক্য নিরূপণ করে এবং অশুভকে বর্জন করে শুভকে অর্জন করে। রোজা তাই শুধুমাত্র তত্ত্ব (theory) নয়, বরং অশুভকে বর্জন ও শুভকে অর্জন করার একমাসকাল অনুশীলন (practice) এবং পরবর্তী এগারো মাস যথাযথভাবে সেগুলিকে মেনে চলার অঙ্গীকার (training), ইসলাম মনে করে যে-তত্ত্বের বাস্তবায়ন বা ব্যবহার হয় না, সে-তত্ত্ব মূলহীন, কেননা, তা দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের কোনো উপকার হয় না। ইসলামে রোজা এক অমোঘ নিয়ম, যা অতি সহজে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

এখন প্রশ্ন হল, এই বৈজ্ঞানিক সমাজ ব্যবস্থায় একমাসকালের রমজানের রোজা কতটা যুক্তিসম্মত। আসুন বিচার করি।

রোজার বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে, সর্বাগ্রেই আমাদের আলোচনা করা দরকার, বিজ্ঞান কাকে বলে? বিজ্ঞান হল মূলত পার্থিব বস্তু বা বিষয়ের ওপর যুক্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল বিশেষ জ্ঞান। তাই বিজ্ঞানের জ্ঞান সার্বিক নয়, আংশিক বিষয়ের, কিন্তু তার যথোপযৌক্তিকতা, নিশ্চয়তা, বিস্ময়কর সাফল্য আমাদের জীবনপ্রবাহকে সহজ সরল ও সচ্ছল করেছে; তাই জীবনের প্রতিটি স্তরে তার অবাধ বিচরণ। সেজন্য বর্তমানে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আমাদের অগ্রসর কল্পনা করতে পারি না। তা ছাড়া বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবেগ ও নির্বিচারের বাইরের জিনিস, সেখানে যুক্তির অতীত কিছুর কোনো স্থান নেই। কিন্তু রোজার মধ্যে কি বৈজ্ঞানিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে— বিচার করা যাক। এটা সর্বজনসম্মত যে, বিজ্ঞান কেবলমাত্র এক প্রকারের নয়, বরং বহু প্রকারের— প্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি আরও অনেক। এ-ক্ষেত্রে এক বিজ্ঞানের পরিধি এবং পদ্ধতি অপর বিজ্ঞান থেকে পৃথক। প্রকৃতিবিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি যতটা ত্রুটিমুক্ত ও নিশ্চিত, সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ততটা সুনিশ্চিত হয় না। তা ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব সবসময় ত্রুটিমুক্ত হয় না। টলেমি, কোপারনিকাস বা কেপলারের তত্ত্ব একে অপরের পরস্পরবিরুদ্ধ। বিজ্ঞানের এই প্রকারভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা তার স্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলি না। এই কারণে তুলি না যে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে আর মানুষ তার উত্তরের সন্ধানে প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত। গতকালের তত্ত্বকে তাই আজ হটিয়ে দিচ্ছে নতুন এক তত্ত্ব এসে। এইভাবেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে, মানুষের চিন্তার অগ্রগতি। তবু মানুষের অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিজ্ঞানের অপব্যবহার

ইফতারের বাজার। টিউনিশিয়ায়।

সমাজ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, যার বিষময় ফল পরবর্তী প্রজন্মকে আরও ভোগ করতে হবে। আজ সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস বোতলবন্দি হয়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে, যা বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে— পৃথিবীকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি! অতি মাত্রায় আমাদের এই বিজ্ঞাননির্ভরতা শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ শতাংশ ব্যক্তি মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ নয়। অতিরিক্ত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ তার মূল কারণ। ফলত দুরারোগ্য ব্যাধি, যা অতিবয়সে হত, সেগুলি এখন অল্পবয়সে চলে আসছে, যেমন— অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ, উদ্‌বেগ, মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ, স্থূলতা, অধিক ওজন, অধিক কোলেস্টেরলজনিত সমস্যা, বাত, স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা, অজীর্ণ, গ্যাস-অম্বল, থাইরয়েডের সমস্যা প্রভৃতি আরও হাজারও রোগ। তাই বলে কি আমাদের বিজ্ঞানবিমুখ হতে হবে? মোটেই নয়। বরং বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধন বা সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে। ইসলাম বিজ্ঞানকে কখনওই অস্বীকার করে না। কোরআন মূলত বিজ্ঞানময় গ্রন্থ (কোরআনীল হাকিম)। ইসলামে বা কোরআনে বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন সন্নিবেশ ঘটেছে। মধ্যযুগে সারাপৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য। ইসলাম মূল বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনকে কখনওই অস্বীকার করেনি। ইসলাম মনে করে, সব বিজ্ঞানেরই নিজস্ব কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতিবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান যা-ই হোক-না-কেন। একটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে, তা হল, সব বিজ্ঞানই কিন্তু মানুষ নাড়াচাড়া করে এবং মানুষই তার উদ্ভাবক ও সিদ্ধান্তনির্ধারক। আর পৃথিবীর মধ্যে মানুষই সবচেয়ে জটিল প্রাণী বলে স্বীকৃত। তার মধ্যে বহু গুণ ও দিকের সমাহার ঘটেছে। তার মধ্যে যান্ত্রিক আন্তরিক এবং স্বর্গীয় গুণের সমাহার ঘটেছে। তার দৈহিক গঠন যান্ত্রিক মাত্র। কিন্তু মানসিক দিক আন্তরিক (ভেতরের সত্তা) এবং স্বর্গীয় দিক আত্মিক সত্তা। এ-ক্ষেত্রে ইসলাম পরিষ্কার বলে, 'ক্বাদ আফ্‌লাহা মান তাজাক্কা' অর্থাৎ সে-ই নিষ্কৃতি পাবে, যার আত্মা পরিচ্ছন্ন। এটা সারা পৃথিবীতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনস্বীকৃত যে, কোনো ব্যক্তি যদি দৈহিক দিক দিয়ে সুদর্শন বা সুন্দর হয় এবং তার মন যদি কলুষিত হয়, তবে কখনওই তাকে ভালো মানুষ বলা যাবে না। বরং সুদর্শন নয় এমন ব্যক্তির অন্তর পরিচ্ছন্ন হলে সে-ই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে।

রোজা দেহ মন এবং আত্মার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অতি সহজ ও সরল উপায়, যা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানসম্মত। রোজা শরীরবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে যুক্তিপূর্ণভাবে সমন্বয়সাধন করে ব্যক্তি ও সমাজ

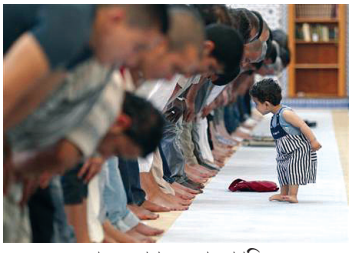

রমজানের প্রথম জুম্মা। প্যারিসে।

মালির বাকোমা শহরে মেডিকেল-ছাত্রীদের ইফতার।

উন্নয়নের পথকে সুগম করে। দেহগত দিক দিয়ে একবছরকাল শরীরে যে-ময়লা জমে থাকে, রোজা তা পরিষ্কার করে দেয়। একমাসকাল অভুক্ত থাকার ফলে শরীরে জমে থাকা ক্যালোরি, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারিন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, পেপসিন, লাইসিন প্রভৃতি খরচ (burn) হয়। তাই অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি বেঁচে থাকে, যার ফলে উচ্চরক্তচাপ, অধিক চর্বি, অধিক কোলেস্টেরল, অধিক গ্যাস-অম্বল, মধুমেহ, অনিদ্রা, উদ্‌বেগ, লিভার ও পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগগুলি নিয়ন্ত্রণে আসে। হাদিস শরিফে তাই বলা হয়েছে, 'রোজা হল শরীরের জাকাত'। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, রোজা শুধুমাত্র ব্যক্তির দৈহিক নয়, মানসিক শুচিতাও নিয়ে আসে, যার ফলে চিত্তের নিবৃত্তি ঘটে এবং মনে শান্তি আসে, ঘুম ভালো হয়, আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূত হয়, মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হয় এবং ব্যক্তি স্থিরমতি ও স্থিরচিত্তের অধিকারী হতে পারে। এইভাবে দেহ ও মনে রোজা শান্তি নিয়ে আসে, ফলে জগৎ ও জীবনে শান্তি স্থাপিত হয়। আজকের সমাজে বহু লোকের আর্থিক প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু শান্তির বড়ো অভাব। রোজা সে-অভাব খুব সহজেই পূর্ণ করে। আবার সমাজবিজ্ঞানের বহুদিক রোজার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা সুন্দর সমাজ গঠনে অপরিহার্য বলে বিবেচিত। যেমন— মিতব্যয়িতা, স্বল্পাহার, নিয়মানুবর্তিতা, পরোপকারিতা, মানুষে মানুষে হৃদ্যতা, নৈতিক শুচিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, একাগ্রতা, সংযমশীলতা, মমত্ববোধ, আত্মশুদ্ধি, সচ্চরিত্রমত্তা, আর্থিক সাম্য ইত্যাদি। হাদিস শরিফে তাই বলা হয়েছে, রোজা সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপকাজ থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখে। কেউ যদি একদিনও অভুক্ত না থাকে, তাহলে অভুক্তের যন্ত্রণা টের পাবে না। যে-মানুষটি অভাবের তাড়নায় নিজের এবং পরিবারের অন্ন জোগাড় করতে না পেরে অসহায় হয়ে অভুক্ত রাত যাপন করে, তার কষ্টের কাছাকাছি কোনোদিনই সে সদর্থে পৌঁছোতে পারবে না। রমজান মাসে রোজার বা উপবাসের বিধান ধনী ও নির্ধন নির্বিশেষে সব মুসলমানকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা তৈরির এমন চমৎকার বিধান দুনিয়ার আর কোনো ধর্মে নেই।

রোজা রেখে ব্যক্তির বদগুণগুলি যদি দূর না হয়, তবে তা শুধু অভুক্ত থাকা হবে, রোজা বলে বিবেচিত হবে না। রোজা তাই অবশ্যই এক বৈজ্ঞানিক পন্থা, যা সুন্দর মানুষ ও সমাজ গঠনের অতুলনীয় বিধি বা ব্যবস্থা। আমাদের উচিত সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে রোজা পালন করা, যাতে শুধু নিজের নয় সবার, শুধু ইহজগতে নয় পরজগতেও মঙ্গল সাধিত হয়। ■

বসনিয়ার সারাজেভো শহরের একটি ইফতার মজলিশ।

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রধান।

হাঁটি-হাঁটি, পা-পা। হাওড়ার এক অখ্যাত গ্রামে আল-আমীনের টলোমলো পায়ে হাঁটার সেই শুরু। আজ সে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে পূর্ব ভারতের রাজ্যে রাজ্যে। আল-আমীন মিশনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে আছে অগণিত ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন আর শ্রমের কাহিনি। তেমনই এক ছাত্রের ধারাবাহিক স্মৃতিকথা, যে-কথায় আছে আল-আমীনের আর সেই শিশু-ছাত্রটির একই সঙ্গে বেড়ে-ওঠার ব্যক্তিগত বিবরণ।

আমার মিশন মিশনের আমি

রোহণ কুদ্দুস

তৃ তী য় কি স্তি

প্রার্থনার সময়

মিশনে আসার আগেই শুনেছিলাম দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়তে হবে। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজ এবং বছরে দুটো ইদের নামাজ ছাড়া গড়পড়তা মুসলমান মানুষজন নামাজ পড়েন, এমনটা কখনও আন্দাজ করতে পারিনি। মুসলমান মানুষ মাত্রেই ধর্মের ব্যাপারে বেশ সংবেদনশীল, কিন্তু তাঁদের মধ্যে শতকরা কতজন নিয়মিত নামাজ পড়েন এবং যাঁরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে আবার কত শতাংশ এই উপাসনাকে নিজেদের জীবনচর্যার মধ্যে আত্মস্থ করেছেন, এ-সন্দেহ আমার বরাবরের। কিন্তু মিশনের প্রথম দিনই হাতেনাতে যে-অভিজ্ঞতা হল, তাতে করে পরের প্রায় একটা দশক এই সন্দেহ আমার থেকে দূরত্ব রেখেই হেঁটেছে।

তিনি স্বপ্ন দেখাতেন: "ওই যে সামনে বিল্ডিংটা হচ্ছে, ওখানে তোমাদের নামাজ পড়ার জন্যে সুন্দর একটা হলঘর বানানো হবে। মার্বেলের মেঝে হবে। কোনো ধুলোবালি থাকবে না।"

মিশনে প্রথম দিন নামাজের অভিজ্ঞতা হল জোহর থেকে। দুপুরে টিফিনের সময় দোতলা হস্টেল-বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটা লাউড স্পিকার বেজে উঠল। সবার দেখাদেখি আমিও নামাজের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

সহজ তিনটে ধাপ:

১. পাজামা-পাঞ্জাবি পরো।
২. ওজু করো।
৩. নামাজের জায়গায় পৌঁছে যাও।

গোলমাল বাধল প্রথম ধাপেই। সকালবেলার মতোই বিপত্তি। লেস কেডসেরই হোক বা পাজামার, কিছুতেই আমি বাঁধতে পারি না। এখন বড়ো হয়ে গেছি, তাই লজ্জায় এই কথা কাউকে বলা যায় না। কেডস তো আর পরতে হয় না, অফিসে পরার জন্যে লেস ছাড়া জুতো কিনি। আর পাজামা পরতে হলে কষে বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিই। কিন্তু এই অবস্থায় হঠাৎ বাথরুম পেলে কী হয়, সে-কথা প্রকাশ্যে লেখার নয়।

যাই হোক, যা বলছিলাম। সে-দিনের মতো আমাদের রুমেরই এক দাদার শরণাপন্ন হয়ে পাজামার ব্যাপারটা সামলানো গেল। এবার পরের কাজ। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে হাজির হলাম সেই পাঁচিল-ঘেরা স্নানের জায়গাতেই। স্নান করার সময় শাওয়ার আর ওজু করার সময় তার নীচে লাগিয়ে রাখা ট্যাপ। সেই ট্যাপের জলে ওজু করতে গিয়ে সব ভিজে একশা। কী আর করা যাবে। জীবনের প্রথম অফিসিয়াল ওজু। বাড়িতে যখন কালেভদ্রে নামাজ পড়েছি, তখন ওজু মানে ছিল কোনোরকমে হাত-পা-মুখ ধোওয়া। কিন্তু এখানে তো আর তা করা যায় না। সবাই দেখছে। বেচাল কিছু করলেই হাসাহাসি করবে। তাই আমার পাশের জনের দেখাদেখি

সবে মিশনের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। মঞ্চে সেদিনের ননীদাদু। পেছনে স্যার, তখন তরুণ।

একটু নকলনবিশি করলাম। আর কারোর দেখে ওজু করা বা নামাজ পড়াটা পরে দেখেছি এমন কিছু দুর্লভ ব্যাপার নয়। পরের দিকে, মানে মিশনে কয়েক বছর থেকে পাখনা গজানোর পর আর কী, এই নিয়ে আমরা মজাও করতাম। হয়তো বুঝতে পারা গেল, কেউ কারো নকল করছে। দ্বিতীয় জন ওজু করতে করতে নিজের মাথার ওপর হাত নিয়ে গিয়ে গুনে গুনে একটা-দুটো করে চাঁটি মারল। প্রথম জন এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে এটাই রীতি ভেবে ব্যাপারটা নকল করে বসল। এসব নিয়ে সময়-সময় হাসাহাসি যা হত, তা আর বলার নয়।

যাই হোক, তখন নামাজ পড়া হত সাধারণ হস্টেল-বাড়ির ছাদে। গরম খুব বেশি পড়লে দোতলার বারান্দায় আর হলঘরে আমরা জায়নামাজ বিছিয়ে নিতাম। তা প্রথম দিন ছাদেই নামাজ হল। ছোটোহুজুর ইমাম, তাঁর সাথে সাথে আর সবাই যা করছে, আমিও তাই করতে লাগলাম দম দেওয়া পুতুলের মতো। রুকুতে গিয়ে দেখলাম, আমার ছায়াটা যেন আমায় দেখছে। হঠাৎ কেন, কে জানে— দারুণ কান্না পেল। বাড়ির কথা আবছা মনে এল। কিন্তু যে-কষ্টটা সব থেকে বেশি হতে লাগল, সেটা অন্য। কেমন একটা বুক ব্যথা করা একাকিত্ব। এবং যখন তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়েছি, একটা অসহায় বোধ জেগে উঠল মনের মধ্যে। টপটপ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল পায়ের কাছে। প্রার্থনার সময় সব মানুষই বড়ো অসহায়।

শুক্রবারের জুম্মার নামাজটা ছিল বিশেষ ব্যাপার। বাসরাস্তার ওদিকে যে-গ্রাম ছিল, যেখানে সেক্রেটারি স্যারের বাড়ি, সেই গ্রামের মসজিদে জুম্মা পড়তে যাওয়া হত। মসজিদটা বেশ ছিল। মোজাইক করা মেঝে, দেওয়ালে নকশা করে কোরআন শরিফের আয়াত লেখা। সব মিলিয়ে সপ্তায় একদিন নামাজ পড়তে যাওয়ার পক্ষে আকর্ষণীয়। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে লাইন দিয়ে আমরা পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে মসজিদে আসছি। আমাদের সার সার উলটো ছবিগুলো হাঁসের দল সাঁতরে এসে ভেঙেচুরে দিয়ে যাচ্ছে— এ-ছবি আমার কাছে বড়ো মোহময় ছিল। যেহেতু মিশনের চৌহদ্দির বাইরে যাচ্ছি, অন্তত এক ঘণ্টার জন্যে হলেও, একটা মুক্ত বাতাস কাজ করত। দেখা গেল একজন ছেলে অন্য জনের মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে দৌড়োচ্ছে। তাকে তাড়া করল অন্য আর-একজন। হঠাৎ পেছন থেকে হাঁক দিলেন বড়োহুজুর। আবার লাইন যেই-কে-সেই।

সবথেকে কষ্ট হত ফজরের নামাজের সময়। ঘুম থেকে উঠে ঢুলুঢুলু চোখে দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে চলেছি সবাই। সবদিনই যে উঠতে ইচ্ছা হত, তা নয়, কিন্তু উঠতেই হত। তারপর মুখ ধুয়ে ওজু করে ঘুমচোখে ফজরের জামাতে সামিল হওয়া। শীতের দিনে ঠকঠক কাঁপতাম। একে সারারাত সিমেন্টের ট্যাঙ্কে থাকা ঠান্ডা জল। তার ওপর ওজু করতে গিয়ে ভিজিয়ে ফেলা সোয়েটার। কিন্তু তখন নেহাতই ছোটো ছিলাম তো। তাই জানতাম এটাই নিয়ম। হস্টেলে থাকতে গেলে কষ্ট করতেই হয়।

সন্ধেবেলা মাগরিবের নামাজের শেষে কখনও কখনও সেক্রেটারি স্যার আমাদের নিয়ে বসতেন। তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল সাকুল্যে দুশো। ছাদের প্রায় পুরোটা ভরে যেত। কিন্তু কোনো মাইকের দরকার হত না। কান পেতে থাকতাম। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ পরিবেশে স্যারের গলা স্পষ্ট শুনতে পেতাম। তিনি স্বপ্ন দেখাতেন: "ওই যে সামনে বিল্ডিংটা হচ্ছে, ওখানে তোমাদের নামাজ পড়ার জন্যে সুন্দর একটা হলঘর বানানো হবে। মার্বেলের মেঝে হবে। কোনো ধুলোবালি থাকবে না।" এখন আল-আমীন মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসের মূল যে হস্টেল বিল্ডিংয়ে ছাত্ররা থাকে, সেটার একতলা গাঁথা হয়ে দোতলার কলামগুলো হাড় বের করা কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে তখন। মাঝের ফুটবল মাঠ পেরিয়ে বিকালে সেখানে যেতাম কখনও কখনও। বোঝার চেষ্টা করতাম, কোন জায়গাটায় হবে নামাজ পড়ার হলঘর। বিশ্বাস করতে কষ্ট হত।

বিশ্বাস করতে আরও কষ্ট হত, স্যার যখন সন্ধেবেলা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া প্লেন দেখিয়ে বলতেন, "ওপরে ওঠার শেষ নেই, ওই প্লেনটারও ওপরে উঠতে পার তুমি।" আসলে স্যার এই ব্যাপারগুলো অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেতেন। কোনো পরিশ্রমী মানুষের চোখের সামনে যদি তাঁর স্বপ্নের ছবিটা আগে থেকেই আঁকা হয়ে থাকে, তাহলে সেই ছবির বাস্তব রূপায়ণ শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর তাই যা আমাদের কাছে ছিল সেদিন অসম্ভব, তা-ই তাঁর কাছে আজকের আল-আমীন মিশন।

মনে মনে যতই অসম্ভব মনে হোক, তখনই বুঝেছিলাম, ওপরে ওঠার রাস্তাটাই শুধু খোলা আছে। হঠাৎ কোনো কারণে আমরা গরিব হয়ে যাচ্ছি। বাপি ঋণের দায়ে ডুবে যাচ্ছে। বাগনানের ভাড়াবাড়ির পাট চুকিয়ে আমরা ফিরে এসেছি গ্রামের বাড়িতে। সেন্ট টমাস কিন্ডারগার্টেন থেকে তাই বাধ্য হয়েই ছাড়িয়ে নিয়ে আমার ভাই বাপাইকে ভর্তি করতে হয়েছে স্থানীয় একটা স্কুলে।

আমাদের দু-ভাইয়ের পড়াশোনা এবং অন্যান্য খরচ যোগাতে বাপিকে প্রচুর ধারদেনা করতে হত। অপমানিত হতে হত। যদিও আমার পড়াশোনার খরচ আংশিকভাবে মিশন বহন করেছে স্কলারশিপ হিসেবে, কিন্তু যেটুকু দিতে হত, সে-সময় সেটাও দুঃসাধ্য ছিল বাপির পক্ষে।

অনেক বাবা-মা সেটাও পারতেন না। সেইসব ছাত্রদের পড়ার খরচ পুড়োটাই দিত মিশন, মানে সেক্রেটারি স্যার, মানে ডোনেশান। আর ডোনেশান মানে তার সাথে অবধারিত অপমান, কটুবাক্য। স্যার শোনাতেন, মিশনের জন্য টাকা চাইতে গিয়ে কোথায় কে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, কে ফোনে তাঁর ছেলেকে বলতে বলেছেন, তিনি বাড়ি নেই। এই সময়টা ওনাকে বাপির খুব কাছাকাছি মনে হত। বাপি এবং স্যার, দুজনেই

কোনো পরিশ্রমী মানুষের চোখের সামনে যদি তাঁর স্বপ্নের ছবিটা আগে থেকেই আঁকা হয়ে থাকে, তাহলে সেই ছবির বাস্তব রূপায়ণ শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর তাই যা আমাদের কাছে ছিল সেদিন অসম্ভব, তা-ই তাঁর কাছে আজকের আল-আমীন মিশন।

পিতা, সন্তানকে স্বপ্নের জায়গায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। যদিও বাপি মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু বলত না। কিন্তু স্যার বলতেন— নিজের কষ্ট কমানোর জন্যে নয়, আমাদের মধ্যে কষ্টটা ছড়িয়ে দিতে। এর থেকে অবধারিত জেগে উঠত জেদ।

নামাজের ভূমি পবিত্র। এবং সে-জায়গায় বসে যে-অঙ্গীকার করা হয়, তা অবশ্যই পালনীয়। আমরা সবাই মনে মনে শপথ নিয়েছিলাম আকাশ ছোঁয়ার, ওই প্লেনটার থেকে উঁচুতে ওঠার। সে-আরোহণ এখনও থামেনি। থামেনি তার জন্যে পরিশ্রমও। স্যার বলতেন, "তোমরা যখন বড়ো হবে, তখন এক দেশ থেকে আর-একটা দেশে ফোন করবে একে অন্যকে।" আর আজ দেখো। আমেরিকা থেকে মেল করছে কোমরুলদা। তুফানদাও আজ এ-দেশে তো কাল ও-দেশে। ব্যাঙ্গালোরে আমি, হায়দ্রাবাদে নাসিম। ভারতের সব শহরে, আমেদাবাদ হোক বা চেন্নাই, দিল্লি বা মুম্বাই— ছড়িয়ে পড়েছে আল-আমীন মিশনের ছেলেমেয়েরা।

এই স্বপ্ন দেখার শুরুটা কিন্তু হয়েছিল নামাজের জায়গাটাতে বসেই। আমাদের প্রার্থনা থেকে, আমাদের উপাসনার ওপর ভিত্তি করে। ভাবলে নিশ্চিন্ত হই, সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন মানুষটা। তিনি আজও স্বপ্ন দেখেন। হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে স্বপ্ন দেখান।

যা হারায়

অনেকক্ষণ বেশ ভারী ভারী কথা হল। এসো, মজার কথা শোনাই। কিছু কিছু ভালো জিনিসের প্রার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেই যায়। যেমন ধরো, রাত্রিবেলা বিয়েবাড়ি গিয়ে পেটপুরে বিরিয়ানি খেলে। ভোর থেকেই মুরগি-ছাগল সব পেট থেকে বের হয়ে আসার জন্যে দাপাদাপি শুরু করল। বা ভূগোল বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে নারায়ণ সান্যালের বই পড়ছ। ভালো বই, উপভোগ করছ নিজের মতো করে। বইয়ের শেষদিকে এসে পড়েছ, এমন সময় ধরা পড়ে গেলে রুম-টিচারের হাতে। দু-চার ঘা জুটল কপালে, বইটাও হাতছাড়া হল।

এই নিয়মেই নামাজ পড়ারও একটা প্রার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট ছিল।

নামাজ শেষ করে তুমি পবিত্র মনে রুমের দিকে পা বাড়ালে। স্যারের ভোকাল টনিকে টগবগ ফুটছ। এখনই গিয়ে ১৪ নম্বর অনুশীলনীর ঐকিক নিয়মের সব অঙ্কগুলো করে ফেলব, ঠিক করেছ। কিন্তু ছাদ থেকে নামতে গিয়ে দেখলে, তোমার হাওয়াই চটিটি গায়েব, মানে বেপাত্তা, সিঁড়ির যেখানে রেখেছিলে সেখানে নেই। আর কেউ পায়ে গলিয়ে পালিয়েছে।

কী করবে তখন?

আমরা ছাত্রদল।

> **আজ দেখো। আমেরিকা থেকে মেল করছে কোমরুলদা। তুফানদাও আজ এ-দেশে তো কাল ও-দেশে। ব্যাঙ্গালোরে আমি, হায়দ্রাবাদে নাসিম। ভারতের সব শহরে, আমেদাবাদ হোক বা চেন্নাই, দিল্লি বা মুম্বাই— ছড়িয়ে পড়েছে আল-আমীন মিশনের ছেলেমেয়েরা।**

দুটো বিকল্প আছে। ১. খালিপায়ে নেমে যাও বা নোংরা পায়ে ঘোরো চারিদিকে। পরের জামাতের জন্য অপেক্ষা করো, যদি তোমার চটিজোড়া আর কয়েক শো চটির মধ্যে খুঁজে পাও। ২. চুপচাপ অন্য কারো চটি পায়ে গলিয়ে নেমে এসো। যতক্ষণ-না কেউ তোমার কাছে এসে ওটা চাইছে, ওই চটি পরেই ঘুরে বেড়াও।

আমার মতো যারা নতুন, তারা অবশ্যই প্রথম বিকল্পটা সৎ হিসেবে বেছে নেবে। কিন্তু ক-দিন যাওয়ার পর দ্বিতীয় পন্থা তোমায় অবলম্বন করতেই হবে। এবং এটা কিছুমাত্র অসৎ নয়। ভরের নিত্যতা সূত্র অনুসরণ করে বলা যায়, "এ-মিশনে চটির সংখ্যা সর্বদা স্থির। তাই কেউ ছাদ থেকে তোমার চটিটা নীচে ফেলে না দিয়ে থাকলে, সবার জন্যে একজোড়া জুতো বরাদ্দ আছে।" অতএব, নিজের চটি না পেলে বেফিকর অন্যের জুতো পরে নেমে এসো। যার চটিজোড়া তুমি বাগাচ্ছ, সে আর কারো জুতো ঠিক হাতিয়ে নেবে (ইয়ে, জুতোর ক্ষেত্রে কি হাতানোটা ক্রিয়া?)।

তবে মনে রেখো, এই পদ্ধতির একটা বিপদ আছে। ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আসা কোনো অভিভাবক হয়তো নামাজ পড়তে এসেছেন। আর নামাজ শেষে দেখলেন, তাঁর জুতোজোড়া নেই। তিনি তো আর তোমাদের মতো চটির নিত্যতা সূত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাই খালিপায়ে নীচে নেমে দেখলেন, তাঁর সাধের চামড়ার জুতোজোড়া উঁচু ক্লাসের এক ছাত্র পায়ে পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললেন, "এটা বোধ হয় আমার জুতো।" নির্বিকার মুখে ছাত্রটি বলল, "ও, তাই নাকি!" তারপর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে আমারও এমন একটা চটি আছে। তাই ভুল করে পরে চলে এসেছি।" তারপর জুতো খুলে দিয়ে সেই নগ্নপদ আবার চলে গেল চটি শিকারে।

এই জায়গাটাতে কিন্তু ভালো অভিনয় করতে হবে, যতই হোক, কোনো অভিভাবক যদি বাইরে গিয়ে বলেন, "মিশনের ছেলেরা গার্জেনদের জুতো পদস্থ (হুম, হাতানো জায়গায় এটা ব্যবহার করা যেতে পারে) করে", তাহলে কি শুনতে ভালো লাগবে, বলো?

চারপাশে তখন আদিগন্ত খেত। আল-আমীন বাড়তে বাড়তে এখন ভবনের পর ভবন।

চটি ছাড়াও আর-একটা জিনিসও আমি প্রায়ই হারাতাম। ট্রাঙ্কের চাবি। প্রত্যেকেরই একটা করে ট্রাঙ্ক ছিল। কিন্তু আমার ছিল দুটো। একটাতে থাকত বিস্কুট, জেলি, মুড়ি, চিঁড়েভাজা এবং ছোটো ছোটো আরশোলার বাচ্চা। অন্যটাতে থাকত বইপত্র— কুইজ, জেনারেল নলেজ, ডিকশনারি এবং ন্যাপথলিন।

দুটো ট্রাঙ্কের চাবি একটা রিংয়ে থাকত। দিনে অন্তত দু-বার নিয়ম করে সেই চাবির রিং আমি হারাতাম। আমাদের রুম-টিচারের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সেই চাবিজোড়া নিয়ে পুরোনো চাবি খুঁজে পেতে-না-পেতেই ডুপ্লিকেটগুলো হারিয়ে ফেলতাম। খাটের তলা, বইয়ের র‍্যাক, স্নানের জায়গা— এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে চাবিগুলো উদ্ধার করা হত। এবং যেহেতু দুটো ট্রাঙ্কের একটাতে খাদ্যদ্রব্য থাকত, তাই চাবি খুঁজতে অল্পবিস্তর সবাই সাহায্য করত।

ক্লাস ফাইভ আর সিক্সের বারো জনকে এই ঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে যেমন আমার বা নওরোজের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেরা ছিল, তেমনই ছিল মামুদ বা দুস্টুর মতো কোটিপতি বাড়ির ছেলেরাও। কিন্তু এগুলো সত্যি করেই কখনও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি আমাদের মধ্যে।

হস্টেল-জীবনের শুরু

তাহলে গল্প এতক্ষণে যতটা গড়াল, মিশনে আমি এসে পৌঁছোনোর তিনদিন পরে একটা পরীক্ষা হল এবং তারপর গরমের ছুটি পড়ে গেল। সেই ছুটি শেষে আমায় মিশনে রেখে যাওয়ার সময় বাপি অনেকগুলো পোস্টকার্ড দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে কিছু ইনল্যান্ড লেটার। এইসব জিনিসপত্র আজকের টেলিফোন মোবাইল ফোনের যুগে আর তোমরা ব্যবহার কর না নিশ্চয়। কিন্তু দু-দশক আগে বাড়ির লোকজনের খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে চিঠিপত্রই ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাপার। খাওয়ার ঘরের পাশে দেওয়ালে একটা ডাকবাক্স ঝোলানো থাকত। আমরা সেটাতে গিয়ে আমাদের চিঠি অর্থাৎ পোস্টকার্ড বা খাম ফেলে আসতাম। প্রতিদিন বিকালে পোস্ট অফিস থেকে একজন পিয়োন-কাকু এসে সেগুলো নিয়ে যেতেন। সঙ্গে আনতেন বাড়ি থেকে পাঠানো চিঠিগুলো।

বাপি একটা খাতায় আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। আমি প্রথম তিনদিন সেইসব ঠিকানায় এক ডজন পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলাম। প্রত্যেকটা চিঠির বয়ান মোটামুটি একইরকম ছিল: "আমি এখানে ভালোই আছি। তোমাদের জন্যে মন কেমন করছে।"

ওগুলো কথার কথা, চিঠি লিখতে গিয়ে আর-কিছু লেখার জিনিস খুঁজে পেতাম না, তাই লেখা। সত্যি করে মনখারাপ করত বাপাইয়ের জন্য। আমি স্কুল থেকে ফিরলে, বিকালে একসঙ্গে খেলতাম। বা ছুটির দিনেও হুটোপাটি করতাম একসাথে। খুনসুটি লেগেই থাকত। তাই বিকেল হলেই খুব কষ্ট হত। বাড়ির বাইরে থাকলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিকেলের কমলা-হলুদ আলোয় মন বিষণ্ণ হয়ে যেত। আজকাল বোধ হয় কষ্টের জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে। শুধু পুরোনো ব্যথার মতো কোনো-কোনোদিন মনখারাপ আসে, থাকে, চলে যায়।

যা বলছিলাম। সবাইকে চিঠি পাঠালেও চিঠির উত্তর দিত শুধু মা। আজও আমার পাঠানো চিঠিগুলো যত্ন করে মা আলমারিতে তুলে রেখেছে। সেগুলো দেখে মনটা হু-হু করে ওঠে। চিঠি পাঠানো তো দূর, আজকাল মায়ের সঙ্গে ফোনেও পাঁচ মিনিট কথা বলার সময় থাকে না। সেইসব দিনগুলোতে অবসর ছিল। মাকে চিঠি লেখার, মায়ের চিঠি পড়ার।

বাড়ি ছেড়ে আসার একটা চিনচিনে কষ্ট ছিল। কিন্তু সময় বড়ো ম্যাজিশিয়ান। আস্তে আস্তে বাড়িতে চিঠি লেখা আর বাড়ির জন্যে মনখারাপ

এপাশে মাওলানা আজাদ ভবন তৈরির পর দূর থেকে দেখা যেত হাই মাদ্রাসা ভবনটিকে।

মিশনে গত কয়েক বছর গিয়ে খেয়াল করেছি, তোমরা ভালো নেই। অধিকাংশের মনখারাপ, মিশনটাকে নিয়মের কারাগার বলে মনে হচ্ছে অনেকের। তাই বলি, মিশনের নিয়মের মধ্যে থেকেও ছোটো ছোটো আনন্দগুলোকে খুঁজে নাও। বন্ধু তৈরি করো। যেখানে তোমার অনেক বন্ধু, সেখানে পৃথিবীর কোনো কষ্টই পীড়াদায়ক নয়।

করাটা কমে গেল। মনোযোগ গেল একই ছাদের নীচে বসবাসকারী আমার রুমের অন্যদের দিকে।

আমার হস্টেল-জীবনের প্রথম ঘর ছিল ১৭ নম্বর রুম। দোতলার দক্ষিণমুখো ঘর। তাই বেছে বেছে ছেলেদের রাখা হত। কতশত অভিজ্ঞতা যে জুড়ে আছে এই ঘরটার সঙ্গে, তার ইয়ত্তা নেই। ক্লাস ফাইভ আর সিক্সের বারো জনকে এই ঘরে রাখা হয়েছিল। সেখানে যেমন আমার বা নওরোজের মতো নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেরা ছিল, তেমনই ছিল মামুদ বা দুষ্টুর মতো কোটিপতি বাড়ির ছেলেরাও। কিন্তু এগুলো সত্যি করেই কখনও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি আমাদের মধ্যে। যেখানে সবাই এক মাদুরে বসে ভাত খাচ্ছে বা একই বিছানায় পাশাপাশি বসে ক্লাস করছে, সেখানে কাউকে আলাদা ভাবার সময় কই?

তা বলে কি একেবারেই তফাত ছিল না? মামুদ ঘুম থেকে রোজই বেলা করে উঠত। হাসেম স্যারের মেজাজ কোনো কারণে খারাপ থাকলে দু-এক ঘা দিয়ে যেতেন ছড়ি দিয়ে। বা কোনোদিন হয়তো কেউ নামাজ না পড়তে গিয়ে কোনো রুম-টিচারের হাতে ধরা পড়ল। হয়তো তার বাড়ি মেটিয়াবুরুজ, হয়তো তার বাবা বা কোনো আত্মীয় আমাদের জেনারেটারটা কিনে দিয়েছেন, তাদের ছোটোখাটো দোষ খুব একটা ধরা হত না। সেটা অবশ্য শুধু যে আর্থিক কারণে, তা বোধ হয় নয়। তাদের নিয়ম ভাঙতে চাওয়ার ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল সবার। তাই 'গোল্লায় যাক' বলে অনেকেই এড়িয়ে যেতেন এগুলো।

অন্য মানুষের কাছাকাছি পৌঁছোতে তার রহস্য জানতে হয়, নিজের রহস্য তাকে জানাতে হয়। এ-ব্যাপারে ডাকনামের কোনো জুড়ি ছিল না। আমরা ১৭ নম্বর রুমের একে অপরের ডাকনাম জানতে লাগলাম। আহসানউল্লা সিদ্দিকীর ডাকনাম রনি এবং তাকে আমরা সেই নামেই ডাকতাম। যার নাম আশিকুল হোসেন, তাকেও আমরা তার ডাকনামে দুষ্টু বলেই ডাকতাম। কিছু ডাকনাম আমরা ব্যবহার করতাম না। যেমন সাহিদদার বাবন, জিয়াউলের অভি, নওরোজের ডেভিড বা সোহেলের লালবাবু (কিউট নাম, কেন যে এটা কেউ ব্যবহার করত না!)। নিজেদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে আমাদের রুমের একটা নাম ঠিক করেছিলাম— Raja Sankaram— আলাদা কোনো মানে নেই। কিন্তু আজও খুঁজতে বসলে আমার হস্টেল-জীবনের প্রথম রুমমেটদের নাম পেয়ে যাই।

এই কথাগুলো নেহাতই অসংলগ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু মিশনে গত কয়েক বছর গিয়ে খেয়াল করেছি, তোমরা ভালো নেই। অধিকাংশের মনখারাপ, মিশনটাকে নিয়মের কারাগার বলে মনে হচ্ছে অনেকের। তাই বলি, মিশনের নিয়মের মধ্যে থেকেও ছোটো ছোটো আনন্দগুলোকে খুঁজে নাও। বন্ধু তৈরি করো। যেখানে তোমার অনেক বন্ধু, সেখানে পৃথিবীর কোনো কষ্টই পীড়াদায়ক নয়। এই কথাগুলো লেখা এই জন্যেই জরুরি। আমরা একে অন্যকে খুঁজে নিয়েছিলাম। নিজেদের সেরাটা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে শিখেছিলাম। তুমিও তোমার বন্ধুদের থেকে ভালোটা নাও।

আমার কাছে বা সাহিদদার কাছে বেশ কিছু কুইজ বই ছিল। বৃষ্টি বাদলার দিনে বা ছুটির দুপুরে বাইরে খেলতে বেরোতে না পারলে, সেইসব বই থেকে নিজেদের মধ্যেই কুইজ কনটেস্ট করতাম। আমাদের রুমের অফিসিয়াল কুইজ টিমের নাম ছিল Seventeen-number Room Quiz Association, সংক্ষেপে SRQA— আমরা এই একটা ব্যাপারে মিশনে সেরা ছিলাম (অবশ্যই আমাদের নিজেদের মতে)। একবার হলরুমের (তখন মিশনে একটাই হলরুম ছিল, ১৮ নম্বর রুম) ছাত্ররা আমাদের কুইজে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, আমাদের দুই রুমের রুম-টিচার মিলে প্রশ্ন বানিয়েছিলেন এবং আমরা বেশ বড়োসড়ো ব্যবধানে জিতেছিলাম। সে-বছর ইংরেজি নববর্ষে হাতে এঁকে ক্যালেন্ডার বানিয়ে, নীচে বড়ো বড়ো করে SRQA লিখে, আমরা বাকি রুমগুলোতে দিয়ে এসেছিলাম। SRQA ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকী সেক্রেটারি স্যারও মাঝে মাঝেই তাঁর বক্তৃতায় আমাদের প্রশংসা শুরু করলেন। ফলে মিশনের অন্য ছাত্ররা আমাদের পছন্দ করত, ঈর্ষা করত এবং অবশ্যই টোন-টিটকিরিও কাটত। ভালো কিছু করতে গেলে কিছু

এগিয়ে চলার নেই মানা। নির্মীয়মাণ ভবনেই শুরু হয়ে গেল ঘরোয়া অনুষ্ঠান।

বক্রোক্তি হজম করতেই হবে, এমনটা তো সেক্রেটারি স্যারকে দেখেই মালুম হত। অতএব আমরা নিজেদের জগতেই মশগুল ছিলাম।

সাহিদদা আবৃত্তি করত 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য', 'খোলনলিচা'। সোহেল ভালো গোলকিপিং করত এবং সাজুগুজু করে লালবাবু হয়ে ঘুরে বেড়াত। জিয়াউল আর আমি সবসময় আদায়-কাঁচকলায় লেগে থাকতাম— মূলত পড়াশোনা নিয়েই। নওরোজ লাল কালি আর নীল কালির ঘনত্ব মাপার জন্যে একটা যন্ত্র তৈরির কথা ভাবত। আরাফাতদা কখনও ছবি আঁকত, কখনও কাউকে চিমটি কেটে মারপিট বাধাত। রনি আর তার মামাতো ভাই খেরকানির সবেতেই দারুণ উৎসাহ। তারা হইহই করে মাতিয়ে রাখত সবসময়।

সবমিলিয়ে এত বন্ধুদের মাঝে থেকে উৎসবের মধ্যে শুরু হল আমার হস্টেল-জীবন। সেই সুখস্মৃতি মনে এলে একটা গানই গুনগুন করে মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়: "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে— "। ■

(পরের সংখ্যায়)

ছবি জাহির আব্বাস (বাচ্চু)

ভারতীয়, চীনা, গ্রিক ও রোমানদের বিখ্যাত জ্ঞানচর্চা যখন নিভু-নিভু, সেই অষ্টম শতাব্দীতে সভ্যতার উজ্জ্বল মশালটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন আরবিভাষী মনীষীরা। সে এক প্রকৃত নবজাগরণ। বিশ্ব-সভ্যতাকে তাঁরা নতুন পথ দেখালেন। আমরা জানব অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দী, ট্রান্স-অক্সিয়ানার সমরখন্দ থেকে স্পেনের কর্ডোভা— এই বিপুল সময় আর স্থান-পরিধির একেক জন মনীষীর জীবন আর কর্মপরিচয় ধরে ধরে। আজ

আল-জাহ্‌রাবি

আধুনিক শল্যচিকিৎসাবিদ্যার জনক

একরামূল হক শেখ

শেষ অংশ

মধ্যযুগের যে-দুই আরবিভাষী চিকিৎসাবিজ্ঞানীর গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, 'আল-তাসরিফ' ছাড়া অপরটি ইব্‌ন সিনা (৯৮০—১০৩৭)-র 'আল-কানুন ফি আল-তিব্ব'। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কয়েক জন নিরপেক্ষ গবেষকের মতে ইউরোপীয় চিকিৎসার আদি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে 'আল-কানুন'-এর তুলনায় 'আল-তাসরিফ'-এর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। প্রসঙ্গক্রমে প্রখ্যাত ইতিহাসকার ফিলিপ খুরি হিট্টি 'আল-তাসরিফ' নিয়ে লিখেছেন, "It contains illustrations of instruments which influenced other Arab authors and helped the foundations of surgery in Europe."।

পশ্চিমি চিকিৎসাবিদ্যায় আল-জাহ্‌রাবির প্রভাব

আল-জাহ্‌রাবির চিকিৎসাকোষ 'আল-তাসরিফ' ইউরোপীয় চিকিৎসাজগৎকে বহুদিন ধরে প্রভাবান্বিত করেছিল। ইউরোপের প্রতিটি মুখ্য ভাষায় এই গ্রন্থটির তরজমা হয়েছিল। 'আল-তাসরিফ' কয়েক শতাব্দী ধরে এক প্রামাণ্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে ইউরোপে প্রচলিত ছিল। গ্রন্থটির প্রথম ল্যাটিন তরজমাকারী উত্তর ইতালির ক্রিমোনা শহরের জেরার্ড (১১১৪—১১৮৭)। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার বহু আরবি পাণ্ডুলিপি জেরার্ড ল্যাটিনে অনুবাদ করেছেন।

ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আল-জাহ্‌রাবির রচনাবলির প্রতি আগ্রহের কারণ তাঁর প্রাঞ্জল বর্ণনামিশ্রিত সৃজনশীল সচিত্র চিকিৎসা-উদ্ভাবন। 'আল-তাসরিফ'-এর ল্যাটিন তরজমা ('Albucasis Metrodus Medendis cum Instruments ad omnes fere morbos depictis') ১৪৯৭, ১৫৩২ ও ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ইতালির ভেনিস, ফ্রান্সের স্টার্সবার্গ ও সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহর থেকে প্রকাশিত। কয়েক শতাব্দী ধরে এই তরজমাটি সালের্নো, মঁপেল্লিয়ে প্রভৃতি আদিপর্বের চিকিৎসা-কলেজে মেডিকেল-ম্যানুয়াল হিসেবে পঠিত হত। জন ক্যানিং (মৃ. ১৭৭৫ খ্রি.)-কৃত 'আল-তাসরিফ'-এর ব্যাখ্যা ও টীকা সংবলিত 'আলবুকাশিস ডে চিরুরজিয়া' ('Albucasis de Chirurgia') নামক ল্যাটিন ও আরবি গ্রন্থ অক্সফোর্ড থেকে ১৭৭৮-এ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণটির এক কপি আজও ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও বদলিয়ান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। ১৮৮১ সালে এটির একটি ফরাসি তরজমাও হয়েছিল।

আল-জাহ্‌রাবির এক সহযোগী হাসদা বেন-শাপরুত (Hasday Ben-Shaprut) ইহুদি যাজক ও চিকিৎসক ছিলেন। বাইজানটাইন সাধু নিকোলাস ও তিনি যৌথভাবে ডায়োস্কোরাইডের মেটিরিয়া মেডিকার আরবি তরজমা করেন। তরজমাকৃত এই গ্রন্থটি বাইজানটাইন সম্রাট দ্বিতীয় কনসটাইনের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক উপহার হিসেবে কর্ডোভার শাসক তৃতীয় আবদুল রহমানকে পাঠানো হয়। প্রখ্যাত ফরাসি শল্যচিকিৎসক গাই ডে চাওল্যাক (১৩০০—১৩৬৮) রচিত এক গ্রন্থ 'চিউজিয়া ম্যাগনা' ('Chiugia Magna') প্রায় তিনশো বছর ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল টেক্সট হিসেবে ইউরোপে প্রচলিত ছিল। এই প্রভাবশালী গ্রন্থে তিনি আল-জাহ্‌রাবির 'আল-তাসরিফ' থেকে প্রায় দু-শো বার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। অপর এক ফরাসি শল্যবিদ জ্যাকস ডালচ্যাম্পসও (১৫১৩—১৫৫৮) তাঁর পুস্তকে 'আল-তাসরিফ'-এর বহুবার উল্লেখ করেছেন।

১৪৭১ সালে, 'আল-তাসরিফ'-এর ২৮-তম অধ্যায়টি 'লিবার সার্ভিটোরিস' নামে নিকোলাস জনশন দ্বারা প্রকাশিত হয়। এটি ল্যাটিনে তরজমা করেন সাইমন জানুয়েনসিস ও আব্রাহাম নামের দু-জন তরজমাকারী। এই তরজমার একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। এই সংকলনে নানাবিধ ওষুধ প্রস্তুতের ভেষজ, প্রাণিজ ও খনিজ উপকরণের বর্ণনার সাথে-সাথে ওষুধ প্রয়োগে রসায়নের ব্যবহারও উল্লিখিত। এ ছাড়াও রজারিয়াস ফ্রুগার্ডি,

রোনাল্ডাস পার্নেনসিস প্রমুখ কয়েক জন ইউরোপীয় পণ্ডিতও 'আল-তাসরিফ' তরজমা করেছেন।

এইসব তরজমা ও সংকলনগ্রন্থগুলি ইউরোপের বিভিন্ন মেডিকেল ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাবিদ্যার মুখ্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। বেশ কয়েক জন আধুনিক গবেষকের মতে 'আল-তাসরিফ' মুসলমান প্রাচ্যে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও এ-কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, আল-জাহ্‌রাবির রচনাবলি ভবিষ্যৎ-চিকিৎসকদের জন্য অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র ভূভাগে জনপ্রিয় ছিল। মানবদেহের গঠনশৈলী ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর গবেষণা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, মস্তিষ্কের তিনটি অংশ— স্মৃতি চিন্তা ও কল্পনা, চিকিৎসাজগতে আজও সমাদৃত। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নব নব আবিষ্কারহেতু পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত ইউরোপীয় শল্যচিকিৎসক পিয়েত্রো আরগাল্লাটা (মৃ. ১৪২০ খ্রি.) আল-জাহ্‌রাবি নিয়ে মন্তব্য করেন, "Without doubt the chief of All Surgeons."।

আল-জাহ্‌রাবির কৃতিত্বের অস্বীকৃতি

দুঃখের কথা, আল-জাহ্‌রাবির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের নামের সাথে জুড়ে দিয়ে তাঁদেরকে চিরস্মরণীয় করা হয়েছে, তার চাইতেও বড়োকথা, আল-জাহ্‌রাবি থেকেছেন অস্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, ধাত্রীবিদ্যার ওয়ালচার পজিশনের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত 'আল-জাহ্‌রাবি পজিশন'। এ ছাড়া কাঁধের গ্রন্থিচ্যুতি হ্রাস করার পদ্ধতির সাথে এমিল থিয়োডর কোচারের নাম জড়ানো হলেও, এটির কৃতিত্বও আল-জাহ্‌রাবির। আপৎকালীন প্রসবে যে-ফরসেপটিকে পিটার চেম্বারলন বলে অভিহিত করা হয়, সেটিরও উদ্ভাবক আল-জাহ্‌রাবি। এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দুই ভারতীয় গবেষক— জাকি কিরমানি ও এন কে সিং। তাঁদের মতে, ওই ফরসেপটি সম্ভবত আল-জাহ্‌রাবি উদ্ভাবিত, কারণ ফরসেপটি চেম্বারলন-পরিবারে দীর্ঘদিন গুপ্তভাবে রক্ষিত ছিল এবং পরে তা প্রকাশ্যে আনা হয়। ('Encyclopedia of Islamic Science and Scientist', Ed. Zaki Kirmani & N K Singh, Global Vision Publishing House, New Delhi, 2005.)।

এরকমই আরও কয়েকটি উদাহরণ হল— আল-জাহ্‌রাবি রক্তবাহের পটিবন্ধনী (Ligaturing blood vessels)-র কথা ফরাসি সার্জন অ্যামব্রোস পার (১৫১০—১৫৯০)-এর প্রায় ছ-দশক আগে উল্লেখ করেও ব্রাত্য। তাঁর আরও এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার মেরুদণ্ডের যক্ষা রোগ। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও ইংরেজ চিকিৎসক পার্সিভাল পট (১৭১৪—১৭৮৮)-এর নামানুসারে

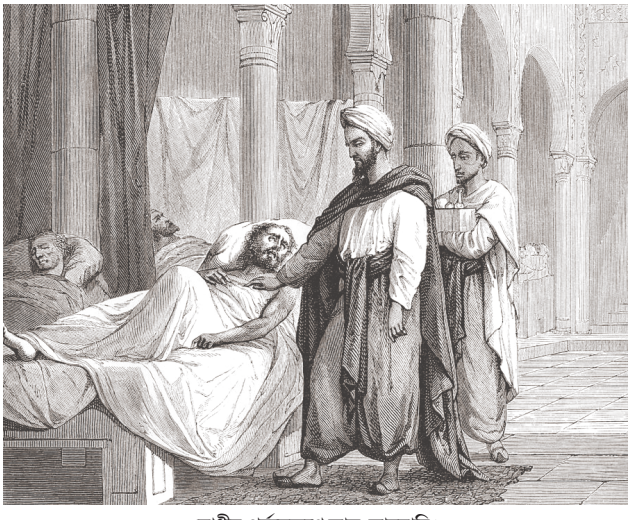

রোগীর পর্যবেক্ষণে আল-জাহ্‌রাবি।

> **আল-জাহ্‌রাবির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের নামের সাথে জুড়ে দিয়ে তাঁদেরকে চিরস্মরণীয় করা হয়েছে, তার চাইতেও বড়োকথা, আল-জাহ্‌রাবি থেকেছেন অস্বীকৃত।**

এটিকে পটের রোগ বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে আল-জাহ্‌রাবি সর্বপ্রথম এ-কথা প্রমাণ করেন যে, এটি একটি বংশগত রোগ, যা আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে তার পুত্রতে প্রেরিত হয়। বর্তমানে এই রোগটির নাম হিমফিলিয়া। আল-জাহ্‌রাবি তাঁর গ্রন্থে এরকম পরিবারের উদাহরণ দিয়েছেন, যে-পরিবারের পুরুষ সদস্য সামান্য ক্ষতের রক্তক্ষরণ-হেতু মারা যান। আধুনিক কালে এই একই বিষয়টি ১৮০৩ সালে পুনরায় উত্থাপন করে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন ডা. জন কনরাড ওটো। কিন্তু আল-জাহ্‌রাবির অবদান বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল।

পৃথিবীব্যাপী প্রাসঙ্গিকতা

আল-জাহ্‌রাবি চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রভাবশালী হয়েছেন। ইউরোপীয় গবেষক এম উলমান তাঁর 'ইসলামিক মেডিসিন' (এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৮) পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "Surgery, which up till now had been left to cuppers and barbers was, thanks to Abul Qasim, completely intergrated into scientific medicine."। বিস্ময়ের কথা, প্রখ্যাত মনীষী রজার বেকন (১২১৪—১২৯৪), যাঁকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাগবেষক হিসেবে অভিহিত করা হয়, তিনিও 'আল-তাসরিফ' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ('Arabian Medicine', E G Browne, Cambridge University Press, 1921.)।

আগেই উল্লিখিত, জেরার্ড-কৃত 'আল-তাসরিফ'-এর তরজমা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। প্রখ্যাত বাইজানটাইন-গ্রিক চিকিৎসক পাওলাস অজিনেটা (৬২৫—৬৯০)-র সাত খণ্ডের চিকিৎসাকোষকে হঠিয়ে 'আল-তাসরিফ' দীর্ঘদিন ইউরোপের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রচলিত ছিল। অপর এক গ্রন্থকার ডোনাল্ড ক্যামবেল, তাঁর 'অ্যারাবিয়ান মেডিসিন অ্যান্ড ইটস ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য মিডল এজেস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আলবুকাসিসের চিকিৎসাপদ্ধতি গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে প্রধানতম স্থান দখল করেছিল।

কয়েক জন নবীন গবেষকের মতে, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের শল্যচিকিৎসার ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ প্রায় সবাই আল-জাহ্‌রাবি দ্বারা প্রভাবিত ও 'আল-তাসরিফ'কে অনুসরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য কয়েক জন হলেন: সালের্নোর রজার (মৃ. ১১৮০), গাগলিলমো সালিসেফতে (১২০১—১২৭৭), ল্যানফ্রাঞ্চি (মৃ. ১৩১৫), হেনবি ডে মন্ডেভিল (১২৬০—১৩২০), বেলোনির মন্ডিনাস (১২৭৫—১৩২৬), ক্যালাব্রিয়ার ব্রুনো (মৃ. ১৩৫২), টারান্টার ভ্যালেস্কাস (১৩৮২—১৪১৭), ফ্লোরেন্সের

নিকোলাস (মৃ. ১৪১১), পাডুয়ার লিওনার্ডো ডা বার্টাপাগাতি (মৃ. ১৪৬০) প্রমুখ।

সেরেফেদ্দিন সাবুনকুওগ্লু (১৩৮৫—১৪৬৮) আনাতোলিয়ার আমাশিয়া হাসপাতালের (দারুস-সিফা) প্রধান সার্জন ছিলেন। ১৪৬০ সালে তিনি 'সেররাহিয়ে-তুল-হান্নিয়ে' নামে এক চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করে তৎকালীন শাসক সুলতান মোহম্মদ (১৪৩২—১৪৮১)-কে উপহার দেন। পরে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। ১৯২০ সালে পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেলে দেখা যায়, তা সেরেফেদ্দিনের চিকিৎসা-অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ 'আল-তাসরিফ'-এর মোটামুটি এক তরজমা। এতে প্রতিটি অস্ত্রোপচারের সচিত্র পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

প্রখ্যাত স্কটিশ অ্যানাটমিস্ট ও চিকিৎসক উইলিয়াম হান্টার (১৭১৮—১৭৮৩) ধমনীগাত্রের কোনো অংশে অস্বাভাবিক প্রসারণ-হেতু রক্তভর্তি স্পন্দনশীল থলির সৃষ্টি (aneurysm) বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু আরবি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। স্যার চার্লস ইলিংওয়ার্থ (১৮৯৯—১৯৯১) রচিত হান্টারের জীবনীগ্রন্থ 'দ্য স্টোরি অফ উইলিয়াম হান্টার' (১৯৬৭)-এর মাধ্যমে জানা যায়, ওই আরবি গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল-জাহ্‌রাবির 'আল-তাসরিফ'ও ছিল, যা হান্টার সিরিয়ার আলেপ্পো শহর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

'দ্য ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল' (বি এম জে পাবলিশিং গ্রুপ), বর্ষ ২, সংখ্যা ৪০৯৬ (জুলাই ১৯৩৯)-এর সূত্রে জানা যায় যে, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেডিকেল পাণ্ডুলিপি ১২৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছিল। বিস্ময়কর তথ্য এই যে, ওই মেডিকেল পাণ্ডুলিপির সাথে 'আল-তাসরিফ'-এর সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। ভবিষ্যতে আল-জাহ্‌রাবি বিষয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণায় আরও বহু বিস্ময়কর তথ্য যে উঠে আসতে পারে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মেডিকেল পাণ্ডুলিপি ১২৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে লেখা হয়েছিল। বিস্ময়কর তথ্য এই যে, ওই মেডিকেল পাণ্ডুলিপির সাথে 'আল-তাসরিফ'-এর সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো।

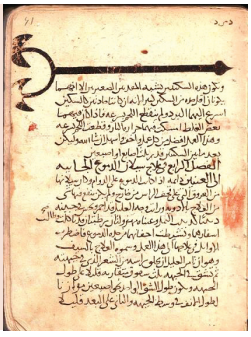

আমরা আগেই 'আল-তাসরিফ'-এর নানান পাণ্ডুলিপির ইউরোপে সংরক্ষণের উল্লেখ করেছি। এশিয়া ও আফ্রিকার নানান মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল: তুরস্কের ইস্তানবুলস্থিত সুলেইমানিয়ে ওমোমি কোতোফানেসিতে সপ্তম শতাব্দীর 'আল-তাসরিফ'-এর ২৮-তম থেকে ৩০-তম অধ্যায়, মরক্কোর রাবাতস্থিত রয়াল লাইব্রেরি অফ মরক্কোতে ১৮৮৯ সালের 'আল-তাসরিফ' প্রভৃতি। ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দের 'আল-তাসরিফ'-এর ৩০-তম খণ্ডটি ভারতের পাটনা খুদাবক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে।

এ ছাড়া আল-জাহ্‌রাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীকস্বরূপ জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট যোহান উলফগ্যাং গ্যেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাসের এমেরিটাস অধ্যাপক ফুয়াত সেজগিন (জন্ম ১৯২৪ খ্রি.) প্রায় দু-শো অস্ত্রোপচারীয় যন্ত্রাংশ পুনর্নির্মাণ করেছেন। ১৯৯২ সালে যন্ত্রাংশগুলির এক প্রদর্শনী মাদ্রিদের প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মিউজিয়ামের তরফে এক ক্যাটালগ ('El-legado Cientifico Andalusi') প্রকাশ করা হয়। রঙিন ফোটো ও পাণ্ডুলিপি সমন্বিত এই তালিকায় আল-জাহ্‌রাবির সাফল্য ও প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাকিস্তানের করাচিস্থিত হামদর্দ ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগারে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষক হাকিম মুহাম্মদ সায়িদ (১৯২০—১৯৯৮) কর্তৃক আল-জাহ্‌রাবির রুপার তৈরি যন্ত্রাংশের স্থায়ী প্রদর্শন আছে। তিনিও এ-বিষয়ে একটি রঙিন পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

মরক্কোর রাজধানী তিউনিশ শহরের চিকিৎসক ও গবেষক অধ্যাপক আহমদ দিয়েব আল-জাহ্‌রাবি উদ্ভাবিত যন্ত্রাংশের পুনর্নির্মাণ করেছেন। ওই যন্ত্রাংশগুলি তিউনিশে অনুষ্ঠিত ৩৬-তম ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিনে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে আল-জাহ্‌রাবির সমস্ত যন্ত্রাংশের তিন ভাষায়— আরবি, ফরাসি ও ইংরেজিতে সচিত্র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রদর্শনীর 'টুলস অফ সিভিলাইজেশন' নামে নামকরণ করা হয়েছিল।

নবমূল্যায়নে আল-জাহ্‌রাবি ও 'আল-তাসরিফ'

আল-জাহ্‌রাবির প্রয়াণ এক সহস্র বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন আজও হয়নি বলেই অধিকাংশ গবেষকের ধারণা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটিও আল-জাহ্‌রাবির নামে নেই। ১৯৮৭ সালে স্থাপিত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাস আল-খাইমার আল-জাহ্‌রাবি হাসপাতাল, ইরাকের মশুল শহরের আল-জাহ্‌রাবি হাসপাতাল ও ইরাকস্থিত জাহ্‌রাবি সেন্টার ফর ইন্টেলেকচুয়াল স্টাডিজ ব্যতীত উচ্চস্তরীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে মুসলমানবিশ্বের দীর্ঘ শীতঘুমের পর ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আল-জাহ্‌রাবির অবদান নিয়ে সামান্যতম হলেও আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে।

১১৪১-এ ক্রিমোনার জেরার্ডের ল্যাটিন তরজমার পরে আরও বহু তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা ফরাসিতে ১৮৬১ সালে এর তরজমা প্রকাশিত হয়। এই তরজমাটি ('La chirugie d'Albucasis') করেন লুসিয়েন লেক্লার্ক (১৮১৬—১৮৯৩)। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এই যে, তিনি এই অনুবাদের ভূমিকা শেষ করেন 'el hamdu Lillah' (আলহামদু লিল্লাহ্ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) দিয়ে।

'আল-তাসরিফ'-এর লিথোগ্রাফে মুদ্রিত অস্ত্রোপচার যন্ত্রাংশসহ সচিত্র এক সংস্করণ ('Fi al-Tadawi bi'l Aemae bi'l-Aidi') সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় ভারতের লক্ষ্ণৌ শহর থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে লক্ষ্ণৌ কলেজ অফ মেডিসিন। 'আল-তাসরিফ'-এর ৩০-তম অধ্যায়ের মূল আরবি-সহ ইংরেজি তরজমা ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭২-১৯৭৩ সালে। এই গুরুত্বপূর্ণ তরজমাটি করেন এম এস স্পিংকস ও জি এল লিউস। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্য নিয়ার ইস্ট ডিপার্টমেন্ট ও লন্ডনের দ্য ওয়েলকাম ইনস্টিটিউট অফ দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিন যৌথভাবে এই তরজমাটি প্রকাশ করে। সৌদি আরবের রিয়াধস্থিত আল-ফারাজাদক প্রেস থেকে ১৯৯৩ সালে

এ আল-নাসের ও এ আল-ত্বাইজরি সম্পাদিত এক সংকলনগ্রন্থ (‘Al-Jira-ha: Al-Maqala Al-Thalathun, Al-Tasrif Li-man Ajaza ‘An Al-Ta’lif’) প্রকাশিত হয়। দামাস্কাস থেকে ২০০৯ সালে এম ওয়াই জাকুর সম্পাদিত ‘আল-তাসরিফ’-এর একটি আরবি সংস্করণ প্রাকাশিত হয় সিরিয়ার সংস্কৃত মন্ত্রক থেকে।

এ-ক্ষেত্রে এ-কথা অবশ্যই পীড়াদায়ক যে, তিরিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ‘আল-তাসরিফ’-এর শেষ অধ্যায় নিয়েই তরজমা আলোচনা ও গবেষণা সীমাবদ্ধ। বাদবাকি উনতিরিশটি অধ্যায় নিয়ে সেরকম কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে ‘আল-তাসরিফ’-এর ২৮-তম অধ্যায়ের ল্যাটিনে অনুবাদ ‘Liber Servitoris’-এ নানান রকমের সাধারণ ওষুধ তৈরির প্রণালী দেওয়া আছে। কিন্তু পরবর্তীতে এই অধ্যায়েরও গবেষণার অগ্রগতি ঘটেনি। এরই মাঝে আশাপ্রদ ঘটনা— মলমের উপকরণ ও প্রস্তুতি নিয়ে ‘আল-তাসরিফ’-এর ২৫-তম অধ্যায়ের ১৯৩৬ সালে প্রখ্যাত দুই গবেষক সামি খলফ হামারনেহ্ ও গ্লেন সান্নেডকার ব্যাখ্যাসহ তরজমা করেন। সংকলনগ্রন্থ ‘এ ফার্মাসিউটিক্যাল ভিউ অফ আলবুকাসিস ইন মুরিশ স্পেন’-এ চিকিৎসায় মলমের ব্যবহার বিষয়টি তিনি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে তুলে ধরেন। ফলে ‘আল-তাসরিফ’-এর চিকিৎসা-থেরাপি, মেটিরিয়া মেডিকা ও ফার্মাসি বিষয়ও যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা প্রমাণিত হয়। কুয়েত ফাউন্ডেশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স ২০০৪ সালে প্রকাশ করেছে ‘আল-তাসরিফ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের তরজমা। তরজমাটির সম্পাদনা করেন ড. শোভি মাহমুদ হামামি। তিনি আল-জাহ্‌রাবির বৈশ্লেষিক ও রোগ-শারীরবৃত্তীয় বিদ্যার মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল প্রক্রিয়ার বিশদ আলোচনা করেছেন। ফলস্বরূপ আল-জাহ্‌রাবির বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রতি তরুণ গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমকালীন চর্চা ও সহস্রবার্ষিকী

প্রখ্যাত ব্রিটিশ শিক্ষামূলক সংস্থা ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন (FSTC) অনলাইন শপিং ই-বে (ebay.in) থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্রোঞ্জ মেডেল সংগ্রহ করেছে। কিন্তু কোন উপলক্ষ্যে বা কোন তারিখের এই মেডেল, তা এতে উল্লেখ নেই। বিক্রেতা ও ইন্টারনেট, কোথাও এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ওই মেডেলের সম্মুখভাগে খোদাই করা নকশায় দেখা যাচ্ছে— আল-জাহ্‌রাবি ডান হাতে, সম্ভবত তাঁর উদ্ভাবিত সরলরৈখিক ক্যাথিটার ধরে আছেন। তাঁকে ঘিরে, সম্ভবত তাঁর ছ-জন শিষ্য একটু নীচের সারিতে বসে আছেন। তাঁদের সামনে একটি পাত্র স্ট্যান্ডে রাখা আছে, এবং ওই পাত্রে কী আছে, তা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। মেডেলটির পেছনে লেখা: “Albucasis (cc.936 A.D.–1009 A.D.) He preserved the surgical knowledge of the Greco-Roman culture and transferred it to a reawakened west.”। যদিও তাঁর প্রকৃত প্রয়াণ ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি কেবলমাত্র শল্যচিকিৎসাবিদ্যার সংগ্রাহক ও হস্তান্তরকারী ছিলেন না, তবুও এই মেডেলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

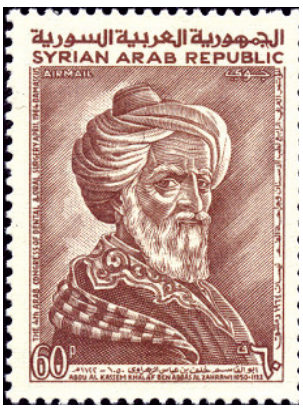

ডাকটিকিটে আল-জাহ্‌রাবি।

সরলরৈখিক ক্যাথিটার উদ্ভাবনের স্মরণে রুপার তৈরি এক স্মৃতিফলকে ওই ক্যাথিটারের নমুনাসহ ‘আল-তাসরিফ’-এর ৩০-তম অধ্যায়ের মূল পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা ও ক্যাথিটার প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। ২১ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০০৬ সালে জেদ্দাহ্‌র কিং আবদেল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টাদশ সৌদি ইউরোলজিক্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে আগত সম্মাননীয় অতিথি-বক্তাদের এই স্মৃতিফলকটি উপহার দেওয়া হয়। আরও একটা স্মৃতিফলকের সন্ধান আমরা পাই, সেটি আল-জাহ্‌রাবির মিকাব উদ্ভাবনের স্মৃতিতে প্রস্তুত করা হয়। মিকাব একটি লিথোট্রাইট, যার দ্বারা বিনা অস্ত্রোপচারে মূত্রাশয়ের পাথর বিচূর্ণ করা হয়। এই স্মৃতিফলকে একটি ক্যাথিটার মডেল, আসল আরবি পাণ্ডুলিপি ও তার ইংরেজি অনুবাদ আছে। উপহারটি ৭ থেকে ১০ মার্চ ২০০৫-এ সৌদি আরবের আল-দাহ্‌রানের দ্য মিলিটারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ ইউরোলজিক্যাল কনফারেন্সে আসা অতিথি-বক্তাদের দেওয়া হয়।

আল-জাহ্‌রাবি হাসপাতাল। ইরাক।

আল-জাহ্‌রাবির মৃত্যুর এক হাজার বছর উপলক্ষ্যে ভূভাগের কোথাও কি স্মরণ অনুষ্ঠান হয়নি। খোঁজ করে মাত্র কয়েকটি তথ্য পেয়েছি। ইরাকের মশুল শহরে ১ থেকে ৩ অক্টোবর ২০১৩-য় দশম মশুল মেডিকেল কনফারেন্স হয়। এই কনফারেন্সে আল-জাহ্‌রাবির মৃত্যুর সহস্রবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে আলাদা একটি সেশনে বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের গবেষণাপত্র পাঠ করেন।

তবে এ-বিষয়ে সর্ববৃহৎ সহস্রবার্ষিকী পালিত হয় ভারতের দিল্লিতে। রিভিজিটিং আবুল কাসিম আল-জাহ্‌রাবিজ লিগ্যাসি ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি নামের এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩, নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইসলামিক কালচার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লির দ্য ইনস্টিটিউট অফ অবজেকটিভ স্টাডিজের সাথে ভারত সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তরের অধীন মাওলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন, হায়দ্রাবাদের মুসলিম এডুকেশন্যাল সোসাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (MESCO) ও দিল্লির ইন্ডিয়া ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে এই কনফারেন্স সংগঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্মেলনটির উদ্‌বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের দুই মন্ত্রী কে রহমান খান ও হরিশ রাওয়াত। ভারতের প্রায় সমস্ত শহর থেকে আসা চিকিৎসক গবেষক ও ইসলামি পণ্ডিতকুল ছাড়াও সৌদি আরব ইরাক মিশর লিবিয়া কাতার প্রভৃতি দেশ থেকেও প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন এই মহাসম্মেলনে।

আলোচনার শেষ পর্বে আমাদের কৌতূহল, আল-জাহ্‌রাবির জন্মভূমি স্পেন কি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূমিপুত্রকে ভুলে গেছে? স্পেন বিস্মৃত অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। কর্ডোভা শহরে মসজিদের কাছাকাছি একটি রাজপথের নামকরণ আলবুকাসিসের নামে করা হয়েছে। এ ছাড়া রোমান সেতু পেরিয়ে গুয়াদালকিভির নদীর অপর তীরে কালাহররা টাওয়ার মিউজিয়ামে আল-জাহ্‌রাবির সোনার তৈরি অস্ত্রোপচার সরঞ্জামের প্রদর্শন আছে। স্পেনিশ ইউরোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ২০১৩-র বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুটি স্মারক পুস্তিকা ও ‘গ্রেট সার্জন অফ কর্ডোভা ইন দ্য মিলেনিয়াম অফ হিজ ডেথ’ নামে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে। প্রায় এগারো মিনিটের ভিডিয়োটিতে আল-জাহ্‌রাবির জীবনকথা, চিকিৎসাপ্রণালী ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাংশ প্রদর্শিত হয়েছে। এই ভিডিয়োটির নির্মাতা এল এ ফরিনা-পেরেজ এবং এম পেরেজ-অ্যালবাসেতে ই আই ওটেরো-তেজেরো।

মহামনীষী আল-জাহ্‌রাবির এক উপলব্ধি দিয়ে আলোচনা শেষ করতে আগ্রহী। তিনি লিখেছেন: “Whatever skill I have, I have derived for myself by my long reading of the books of the Ancients and my thirst to understand them until I extracted the knowledge of it from them. Then through the whole of my life I have adhered to experience and practice … I have made it accessible for you and rescued it from the abyss of prolixity.”। ■

সবুজ ঘাসের দেশে পতঙ্গের অগাধ রাজ্য। সেখানে তারা মুক্তির উল্লাসে গান গায়, কখনও-বা হাওয়ায় হাওয়ায় মেলে দেয় মুক্ততার ছোটো ছোটো ডানা। তারা মাটির নিবিড়ে ঘাসের গভীরে ঘর বাঁধে, কথা বলে আপন ভাষায়। কেমন সে-ভাষা? তা জানতে একটি রুশ গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ। লিখেছেন

ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভ

গঙ্গাফড়িংয়ের টেলিফোন

কর্নেই চুকোভস্কির 'টেলিফোন' নামে একটা কবিতা আছে। তার আরম্ভটা বোধ হয় তোমাদের জানা আছে:

টেলিফোন বাজে ঝনঝন।
— বলছেন কে?
— হাতি হে!

তা হাতিদের কথা যদি ধর, সত্যি বলতে কী, তারা কথা বলতে পারে কি না, জানি না। কিন্তু গঙ্গাফড়িংয়েরা— ঠিক জানি— টেলিফোনে কথা বলতে পারে। এটা অবশ্য ঠিক যে, তারা রিসিভার তোলে না, ডায়ালও করে না। তবে তাদের নিছক কথা বলার সুযোগ দিলে, তারা কথা বলতে পারে।

গঙ্গাফড়িংয়েরা যে গুনগুন করে, তা লোকের চিরকালই জানা ছিল। কিন্তু কেন তারা এমন আওয়াজ করে, এ-প্রশ্ন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। গুনগুন করে— এই পর্যন্ত। হয়তো-বা কিছু করার নেই বলে।

কিন্তু লোকে যত বেশি প্রকৃতির জীবন সম্পর্কে জানতে পারল ততই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল: না, গঙ্গাফড়িং কিছুই করার নেই বলে গুনগুন করে, তা নয়। আর আদৌ এমন কারণেও নয় যে, পৃথিবীতে বাস করতে তার বেশ লাগছে। সত্যি-সত্যিই যদি বেশ লাগত তাহলে হত উলটো— তার উচিত হত চুপ করে থাকা, কেননা গানের খেসারত হিসেবে তার নিজের জীবন যাবার ঝুঁকি আছে। সবুজ জিনিসকে তো আর সবুজ ঘাসের ভেতরে দেখার জো নেই। অথচ শুনতে চাইলে শুনতে পারো। তার মানে, এমন কোনো ব্যাপার আছে, যার জন্য সে গুনগুন না করে পারে না। নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, কেবল পুং-ফড়িংয়েরাই আওয়াজ করে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী এও অনুমান করলেন যে, গুনগুন শব্দের সাহায্যে তারা তাদের বান্ধবীদের ডাকে। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানী সেটা বিশ্বাস করলেন না। আর তখনই গঙ্গাফড়িংয়েরা টেলিফোনে কথা বলে।

বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন, এমন এক পরীক্ষা করে দেখবেন, যাতে বোঝা যায় স্ত্রী-ফড়িং গান শুনতে পায় কি না আর সে-গানে তার প্রতিক্রিয়াই-বা কীরকম হয়। গানের প্রতি সে যদি উদাসীন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, পুং-ফড়িংয়েরা স্ত্রী-ফড়িংদের জন্য গায়, তাঁদের কথাই সত্যি। আর যদি দেখা যায় যে, এটা তার পক্ষে তুচ্ছ ব্যাপার নয়, তাহলে বুঝতে হবে গঙ্গাফড়িংয়েরা বাস্তবিকই কথাবার্তা বলতে পারে।

একটা ঘরে টেবিলের ওপর একটি গঙ্গাফড়িংকে বসিয়ে দেওয়া হল, তার সামনে রাখা হল টেলিফোন রিসিভারে লাগানো মাইক্রোফোনের মতো একটি মাইক্রোফোন। আরেক ঘরে শব্দগ্রাহী যন্ত্র রেখে সেখানে ছাড়া হল এক স্ত্রী-ফড়িংকে।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর গঙ্গাফড়িং ধাতস্থ হয়ে গান শুরু করল। সে কিন্তু বুঝতেই পারেনি যে, কোনো তৃণভূমিতে অবস্থান না করে অবস্থান করছে বীক্ষণাগারে আর ধারেকাছে স্ত্রী-ফড়িং নাও থাকতে পারে। মোটকথা ফড়িং গান ধরতে সে-গান বয়ে অন্য ঘরে এসে পৌঁছোল, স্ত্রী-ফড়িং তা শুনতে পেল। গঙ্গাফড়িংয়ের গুনগুন আওয়াজ কীভাবে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায়, সেটা অবশ্য কারো জানা ছিল না। তা ছাড়া তাকে রূপান্তর

করাও যায় না। তবে স্ত্রী-ফড়িংয়ের আচরণ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এ-গান তারই জন্য। গানের মোদ্দাকথা হল: "আমি এখানে, এই যে আমি!"

স্ত্রী-ফড়িং কথা বলতে পারে না— এমনকী ফড়িঙি ভাষায়ও নয়। পারলে হয়তো কিছু-না-কিছু একটা উত্তর দিত। কিন্তু শব্দ যেহেতু নেই, সেই হেতু কাজ করা দরকার! আহ্বান লক্ষ্য করে সে তাড়াতাড়ি ছুটল। গানটা এসেছে কালো রিসিভারের ভেতর দিয়ে। রিসিভার অবশ্য আদৌ গঙ্গাফড়িংয়ের মতো নয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, সে ওর ভেতরে আছে? স্ত্রী-ফড়িং তাই যন্ত্রের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে।

ঝিঁঝি পোকা।

এইভাবে টেলিফোনে কথা বলে গঙ্গাফড়িংয়েরা মানুষের কাছে তাদের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করল।

কিন্তু একটা রহস্য জানার পর লোকে নতুন এক প্রহেলিকার সম্মুখীন হল: গঙ্গাফড়িংয়েরা যে গান গায় অথবা কথাবার্তা বলে, তা সব সময় একই রকমের নয় কেন? মনে হয়, এই ধ্বনিগুলির অর্থ বিভিন্ন। বাস্তবিকই তা-ই— যেমন গঙ্গাফড়িং জোরালো সংকেত দিচ্ছে— তার মানে, জানাচ্ছে কোথায় সে আছে, ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। আবার সঙ্গিনী যখন পাশে তখন গঙ্গাফড়িংয়ের গানের সুর পালটে যায়— উচ্চগ্রামের প্লুতস্বরের জায়গায় হতে থাকে মৃদু শান্ত ধ্বনি।

কিন্তু হঠাৎ সুর আবার চড়ে গেল। এবারে গান প্লুতস্বরের মতো নয়। তা ছাড়া সঙ্গিনী যখন পাশে আছে তখন ডাকবেই-বা কাকে? না, এখানে ব্যাপারটা অন্য কিছু। ওহো, বোঝা গেছে! দেখা যাচ্ছে, অন্য একটি গঙ্গাফড়িং এসে হাজির হয়েছে। এটা এখানে এল কী করে? ঠিক এখানেই ওর আসার কী ঠেকা পড়ল? সম্ভবত ওর নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। কিন্তু এখানে জায়গা খালি নেই, তাই জায়গার মালিক চড়া সুরে এ-সম্পর্কে আগন্তুককে সাবধান করে দিল। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও আবার বলতে হয় যে, গঙ্গাফড়িংদের আওয়াজ মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় না। এ-জায়গা আমার, ভাগ বলছি, নইলে ঠেলা বুঝবি— এভাবে ভাষান্তর করা যায় না। তবে গঙ্গাফড়িং শব্দের কোনো তোয়াক্কা করে না— একজন চিৎকার করল, অন্যজন শুনতে পেল। আগন্তুক হয় নিজের জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে যাবে, নয়তো আইনসংগত মালিককে তাড়ানোর মতলব করবে। তখন শোনা যাবে যুদ্ধের হুংকার আর গঙ্গাফড়িংদুটিও একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরাজিত গঙ্গাফড়িং— সে আইনসংগত মালিক হোক আর আগন্তুক হোক— যে-ই হোক-না-কেন— পিঠটান দেবে।

গঙ্গাফড়িংয়েরা যে গান গায় অথবা কথাবার্তা বলে, তা সব সময় একই রকমের নয় কেন? মনে হয়, এই ধ্বনিগুলির অর্থ বিভিন্ন।

গঙ্গাফড়িংদের শ্রবণশক্তি খুবই ভালো, কিন্তু তাদের কান থাকে পায়ের ওপর। আচ্ছা, মাটি তো চমৎকার ধ্বনিপরিবাহী— তাহলে তাদের গান কি মাটিতে পরিবাহিত হয়ে যায় না? এটা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে জনৈক প্রাণীবিজ্ঞানী ঠিক করলেন, গঙ্গাফড়িংদের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবেন, তিনি তাই দুটি পুং-ফড়িংকে বেলুনের সঙ্গে বাঁধলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ গঙ্গাফড়িংদুটি সে-দিকে কোনো মনোযোগই দিল না— তারা আকাশেও গালিগালাজ ও তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেতে লাগল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তারা একে অন্যকে শুনতে পায়, তার মানে ধ্বনি মাটিতে পরিবাহিত হয়ে যায় না।

এইভাবে গঙ্গাফড়িংয়েরা কথাবার্তা বলে। তা ছাড়া তাদের নিকট ওরকমের হয়, তার জন্য বিভিন্ন বেগে ও বিভিন্ন শক্তিতে ডানায় ডানায় ঘষা লাগাতে হয়। তাহলেই ধ্বনি হবে কখনও জোরালো, কখনও অপেক্ষাকৃত মৃদু।

জলফড়িং।

আবহাওয়া যখন শান্ত থাকে তখন বহু মিটার দূর থেকে গঙ্গাফড়িংদের গান শোনা যায়। আবার মাটির তলায় চুপচাপ সতেরো বছর কাটায় এবং জীবনের মাত্র শেষ কয়েক সপ্তাহ গান গায় এমন কোনো কোনো জাতের ঝিঁঝি-গোত্রীয় পোকার গান স্টিম-ইঞ্জিনের শিসের মতো শোনায় আর তা প্রায় আধ-কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শোনা যায়। এক জাতের ঝিঁঝি পোকার গান আবার দেড় কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়।

কেবল যে গঙ্গাফড়িংয়েরা এবং তাদের জাতিরাই কথাবার্তা বলতে পারে, তা অবশ্য নয়। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে গণনা করে দেখেছেন যে, প্রায় দশ হাজার জাতের এমন সব কীটপতঙ্গ আছে, যারা কথাবার্তা বলতে পারে। যেসমস্ত আওয়াজে অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেতে তাদের অধিকার আছে, কোনো কোনো ছয়পেয়ের ক্ষেত্রে সেগুলির সংখ্যা বিশেরও ওপরে। তাদের মধ্যে যেমন আছে আহ্বান হুমকি, তেমনি আছে উত্তেজনা, আর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি যে, জায়গা খালি নেই ইত্যাদি। আবার পঙ্গপালদের, যারা পেছনের পায়ের সাহায্যে কথা বলে পায়ে পা ঘষে ধ্বনি সৃষ্টি করে— এমন সংকেতও আছে, যা শুনে গোটা পাল আকাশে ওড়ে। এটা কিন্তু মোটেই পাখার আওয়াজ নয়— এ হল বিশেষ সংকেত। পঙ্গপাল ওড়ার সময় যে-ধ্বনি সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানীরা তার টেপ করেন, পরে কয়েকটি পতঙ্গকে বধির করে দেওয়া হয়— প্রসঙ্গত, পঙ্গপালের কান থাকে পেটের ওপর— আর তাদের উপস্থিতিতেই ওড়ার সংকেত পুনরুৎপাদন করা হল। বধির পতঙ্গরা সংকেতের প্রতি মন দিল না। বাকিরা কিন্তু আকাশে উড়ল। দেখা যাচ্ছে, পতঙ্গের ডানার প্রয়োজনীয়তা কেবল ওড়ার জন্য নয়, কথাবার্তা চালানোর জন্যও বটে। ■

তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক। কারবালা প্রান্তরে মর্মস্পর্শী যুদ্ধের ইতিহাস যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আজও তা মানুষকে ছুঁয়ে যায়। তিনি 'জমিদার দর্পণে'রও লেখক। স্বাধীনতার এক-শো বছর আগে জন্মানো সেই মনীষী-লেখকের কথা।

মীর মশাররফ হোসেন

সা হি ত্য ক র্ম ও স মা জ চি ন্তা

আমিনুল ইসলাম

ঊনবিংশ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমি এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণত ভিন্ন। সমকালে জাতি-রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয়, স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশ এবং শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির ফলে জনগোষ্ঠীর মানসজগতে তার প্রভাব, এসব পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দু-আড়াই-শো কিংবা তিন-শো বছর আগেকার মুসলমান রচিত সাহিত্যকে খুব একটা উল্লেখযোগ্য অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে না। এবং এটাও যথার্থ বাস্তবতা যে, সে-সময়টাতে শৈলীঋদ্ধ সাহিত্যনির্মাণ অসম্ভব ছিল বই কী! তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা পরিবেশ ছিল প্রতিকূল। এরপরও মধ্যযুগের মুসলমানদের গৌরবময় অতীতের কথা ভেবে, সেই ধারাবাহিকতা না হোক, ন্যূনতম হলেও চর্চাটা অব্যাহত থাকুক, এমন চেতনা থেকে অনেকেই সাহিত্যনির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যমানস পর্যালোচনায় প্রায়শই এমন দৃশ্যপটই সমুপস্থিত। পরবর্তীকালটাই বরং অধিক উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২), কবি কায়কোবাদ প্রমুখ জন কয়েক সাহিত্যসাধক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরাও কিন্তু সাহিত্যচর্চায় অগ্রণী হয়েছেন মূলত বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, অক্ষয়কুমার প্রমুখর প্রেরণায় ও প্রভাবে।

মীর মশাররফ হোসেনের আগেও কয়েক জন মুসলমান সাহিত্যসেবীর দেখা আমরা পাই। তাঁরা প্রবন্ধ, নকশা ও প্রহসন এবং নাটক জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয় খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকীর (১৮০৮—১৮৭০)। তাঁর 'উচিৎ শ্রবণ' গ্রন্থটি (১৮৬০) গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত প্রবন্ধ জাতীয় রচনা। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলি আহসান তাঁদের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' গ্রন্থটিকে 'একটি ধর্মপুস্তক' বলে উল্লেখ করেছেন।

খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকীর পরে এবং মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বে আরও কতিপয় লেখকের কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, যা মুসলমান বাংলা সাহিত্যে উল্লেখের দাবি রাখে। এগুলি হল: গোলাম হোসেনের 'হাড় জ্বালানী' (১৮৬৪), শেখ আজিমদ্দিনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮) এবং আয়েন আলী শিকদার রচিত 'বিধবা বিলাস' (১৮৬৮)। এসব লেখক ছাড়াও মুন্সী নামদার নামে আরেক জন লেখকের কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ড. কাজী আব্দুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' গ্রন্থে। তিনি মুন্সী নামদার রচিত মোট এগারোখানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, যেগুলি ১৮৬৩ থেকে শুরু করে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর উল্লিখিত মুন্সী নামদারের গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের এ কি দম্ভ' (১৮৬৩), 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' (১৮৬৭), 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' (১৮৬৮) প্রভৃতি। এসব লেখকের গ্রন্থ সম্পর্কে বিশেষ কোনো প্রশংসাসূচক মন্তব্য না করা গেলেও সত্যি যে, এসব গ্রন্থের কোনো-কোনোটিতে উনিশ শতকের সমাজজীবনের গ্লানিপূর্ণ দিকের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এসব লেখকের বিশিষ্টতা এজন্যে যে, উনিশ শতকের একটি বিশেষ সময়ে এঁরাই গদ্যে ও পদ্যে মুসলমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রিম ভিতটি তৈরি করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যের সার্থক মুসলমান রূপকার মশাররফ হোসেন অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বোক্তদের তুলনায় অধিকতর বেশি অগ্রগামী চিন্তা-চেতনার পোষক ছিলেন বলে রক্ষণশীলতা শাসিত স্বসমাজের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ তাঁর কাছে তীব্র ও ব্যাপক হয়েছিল। তা ছাড়া মশাররফের রচনায় স্বদেশ, স্বাধীনতা, স্বরাজ— এই বিষয়গুলো নানাভাবে কখনও কখনও উত্থাপিত হয়েছে। মশাররফ হোসেনের জীবনকাল বঙ্গদেশের গুরুত্বপূর্ণ সময় ও ঘটনাবলিকে স্পর্শ করেছে। উনিশ শতকের নবচেতনায় কল্লোলমুখর সময়ে তাঁর জন্ম। ১৮৫৭-র সিপাহি

বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের জন্ম, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ— এসব তাঁর সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে একজন সচেতন সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে মশাররফের আবির্ভাব। তাই তাঁর বেশির ভাগ রচনাই সমাজসম্পৃক্ত কিংবা ইতিহাস সংলগ্ন।

কুষ্টিয়ায় লেখকের ধ্বংসপ্রাপ্ত পৈত্রিক বাসস্থান।

মশাররফ হোসেন তৎকালীন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম জেলা) গৌরী নদীর তীরে সাঁওতার নিকটবর্তী লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোয়াজ্জেম হোসেন, মাতা দৌলতুন্নেসা। মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন সে-অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু একজন জোতদার এবং সম্মাননীয় ব্যক্তি। মীর উপাধি তাঁরা পেয়েছিলেন রাজার প্রদত্ত খেতাবরূপে। কিন্তু সৈয়দ ছিল বংশানুক্রমিক উপাধি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক' রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে মীর মশাররফ হোসেনের জন্মতারিখ বলেছেন— ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ সাল। লেখক নিজে 'আমার জীবনী' গ্রন্থে বলেছেন, ১৮৪৩ সালে তাঁর জন্ম হয়। গ্রামের বাড়িতে মুনশি জমিরুদ্দিনের হাতে মশাররফের শিক্ষার হাতেখড়ি। মুনশি সাহেবের কাছে এক বছর কোরআন শিক্ষার পর স্থানীয় জগমোহন নন্দীর পাঠশালাতে ভর্তি হন তিনি। শৈশবে তিনি ছিলেন স্থির ও শান্ত প্রকৃতির। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কুষ্টিয়ার নবাব মীর মোহাম্মদ আলি প্রতিষ্ঠিত নবাব হাই স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন পর অনিবার্য কারণে তাঁকে স্কুল ত্যাগ করতে হয়। তারপর পদমদীর নবাব উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। উঁচু শ্রেণিতে তিনি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর সে-সময় হতেই।

তিনি প্রায় পঞ্চাশটির মতো গ্রন্থ (অপ্রকাশিতসহ) রচনা করেন। তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্য বিস্ময়কর। একাধারে তিনি উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, প্রহসন, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি লিখেছেন। তাঁর এসব রচনায় যেমন রয়েছে ধর্মভাব ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, তেমনি রয়েছে সাময়িক প্রসঙ্গ রাজনৈতিক বিষয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। এত বিষয় ভাব ও অনুভূতি মশাররফ হোসেন তাঁর বিশাল সাহিত্যে এক অসাধারণ নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বর্ণিল পারঙ্গমতার বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মশাররফের জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ও বই পড়ার ঝোঁক ছিল উল্লেখ করার মতো। মাঝেমধ্যে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকেও বই পড়ে শোনাতেন। মশাররফ হোসেন মোটামুটিভাবে সব ধরনের বই পড়তেন। উপন্যাস, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস, আইন, ধর্ম তাঁর পাঠ্যতালিকায় ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে ছিল— কোরআন শরীফ, শাহনামা, চাহার দরবেশ, কাসাসুল আম্বিয়া, রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলি, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলি, গিরিশ গ্রন্থাবলি, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', কাঙাল হরিনাথের 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ', ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলি, হরিনাথ গ্রন্থাবলি, অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', শেখ আব্দুর রহিমের হজরত মহম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত, ভাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদৌল্লা', গিরিশচন্দ্র সেনের 'তাপসমালা', বড়পির সাহেবের জীবনী ইত্যাদি।

মুক্তবুদ্ধির প্রেরণা মশাররফ হোসেনের লেখকসত্তাকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর রচনায় এমন কিছু উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেগুলোর ভিতর দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ফুটে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে মশাররফ হোসেনের ব্যবহৃত ভাষার প্রসঙ্গকে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁর ভাষায় প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। লেখকের এই প্রবণতার ব্যাপক পরিচয় মেলে তাঁর সুবিখ্যাত রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'তে, এখানে তিনি অনেক ধর্মীয় শব্দকে সংস্কৃত শব্দে প্রতিস্থাপন করেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনই সাহিত্যে প্রথম 'সেক্যুলার' শব্দ প্রয়োগের দুঃসাহস দেখান। এজন্য স্বকালে স্বসমাজের কাছে তাঁকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। মশাররফ নিজে লিখেছেন: "বাঁধা ঘাটে বসিয়া অনেক কথাই হইল। সেই সময়ে আমার মনে একটা কথা উদয় হইল যে সাবেক এসলামি ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার সেবা মুসলমান সমাজে আমিই প্রথম করিলাম। আমি এ পথে প্রথম অগ্রসর হইলাম। আমার মুখেই প্রথম 'ঈশ্বর' বাহির হইয়াছে। এই প্রকার অনেক কথা আমারই মুখে অগ্রে বাহির হইয়াছে। লিখা হইয়াছে, ছাপার অক্ষরে কেতাবে উঠিয়াছে। খোদা বা এলাহি স্থানে জগদীশ্বর পরমেশ্বর, পানি স্থলে জল, নামাজ স্থলে উপাসনা, এই রূপ শব্দ বাহির হওয়ায় মুসলমান সমাজে আমার নিন্দার চর্চা হইতে লাগিল। নিন্দার আরও বেশি কারণ হইল যে হিন্দুদিগের সহিত মেলা ও মেশা ভাব বেশি। সর্বদা বসা ওঠা। তাহাদের বাটীতে যাওয়া আসা, একত্র আহারাদি করা— এই সকল কারণে মুসলমান সমাজে চারিদিকেই আমার আচরণ ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। আমি যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছি তাহা কেহই পাঠ করেন না। ঈশ্বর জগদীশ্বর পরমেশ্বর পানি স্থানে জল শুনিয়াই হাড়ে চটিয়া কাফেরী পুস্তক বলিয়া অনেকেই ফেলিয়া দেন, দূরে নিক্ষেপ না করিয়া হাতে উঠাইয়া ঘৃণা চক্ষে জঘন্য ব্যবহারে আছড়াইয়া ফেলিয়া দেন। আমি ব্রাহ্ম সমাজের নগরকীর্তনে তাহাদের সহিত মিশিয়া গান গাইতে যাই। হিন্দুদিগের সংকীর্তনেও যোগ দেই। এই সকল দেখিয়া মুসলমানগণ আরও চটিয়া গেলেন।"

মশাররফ হোসেনের রচনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এমন হিন্দু সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাবচিহ্ন বর্তমান। পরবর্তী জীবনে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেও, কৃষ্ণনগরে তাঁর ছাত্রজীবন হিন্দুদের দ্বারা খুব বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিল, যে-প্রভাব তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে আজীবন বর্তমান ছিল। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া অঞ্চলেরও হিন্দুপ্রভাবিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। কৃষ্ণনগরের মতো এখানকার মুসলমানগণও নাম ব্যবহারে যথেষ্ট হিন্দুয়ানি ভাবধারাসম্পন্ন ছিলেন। যুক্তির খাতিরে এ জাতীয় হিন্দুয়ানিকে 'আমার জীবনী' (১৯০৮) গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণনগরের দোষ হিসেবে

একজন সচেতন সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে মশাররফের আবির্ভাব। তাই তাঁর বেশির ভাগ রচনাই সমাজসম্পৃক্ত কিংবা ইতিহাস সংলগ্ন।

মীর গেট। ভেতরে লেখকের নামেই আজ স্কুল, কলেজ, মিউজিয়াম। তাঁরই পৈত্রিক ভিটেয়।

বর্ণনা করলেও, প্রকৃতপক্ষে উক্ত হিন্দুপ্রভাব যে সমকালীন নদীয়া জেলার সর্বত্রই কমবেশি ছিল 'বিবি কুলসুম'তেই তিনি তা স্বীকার করেন। মশাররফ হোসেন ১৯১০ সালে যখন তাঁর স্ত্রী কুলসুমের স্মরণে 'বিবি কুলসুম' রচনা করেছিলেন, তখনও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন: "মুসলমানের নাম লালন, মন্দির নদীয়া জেলায় আশ্চর্য নহে। নদীয়া কুষ্টিয়া অঞ্চলে কৃষক অথবা বিশ্বাস মণ্ডল শ্রেণীর লোকমধ্যে অনেক হিন্দু নাম আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।" এ-সময়ে কুষ্টিয়া-কৃষ্ণনগর-মেহেরপুর অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই আত্মীয়স্বজনকে মাসি পিসি কাকা প্রভৃতি হিন্দুয়ানি ডাকে সম্বোধন করতেন বলে মশাররফ হোসেন জানান।

মশাররফ হোসেনের পারিবারিক জীবনেও এ-প্রথা পালনের প্রতি তাঁর অনুকূল মনোভাবের সাক্ষ্য মেলে। তিনি তাঁর নয় ছেলে-মেয়ের নাম একই প্রক্রিয়ায় রেখেছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে সকলেরই দুটো নাম ছিল— একটি মুসলমানি, অন্যটি হিন্দুয়ানি। তাঁর ছেলেদের নাম যথাক্রমে মীর ইব্রাহীম হোসেন ওরফে সত্যবান, আসরাফ হোসেন ওরফে রণজিৎ, ওমরদারাজ ওরফে সধুম্ব, মহবুব হোসেন ওরফে ধর্মরাজ এবং ছোটোছেলের ডাকনাম যুবরাজ। অন্যদিকে মেয়েদের নাম ছিল যথাক্রমে রওশান আরা ওরফে সতী, আমিনা খাতুন ওরফে কুকি, ছালেহা ওরফে সুনীতি এবং সালেমা ওরফে সুমতী। মশাররফ হোসেনের স্ত্রী কুলসুমের বিবাহপূর্ব নামও ছিল হিন্দুদেবী কালীর নামানুসারে। এমনকী, মশাররফ হোসেন তাঁর প্রিয় কুকুরের নামটিও রেখেছিলেন মঙ্গালা।

মশাররফের জীবনের প্রথম পর্বে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হিন্দু বিদ্যাতীর্থ নবদ্বীপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: "জগদ্‌বিখ্যাত পবিত্র নাম নবদ্বীপ। সরস্বতীর কমলাসনে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপ স্থাপিত রহিয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় জগৎ নিলয় না হওয়া পর্যন্ত নবদ্বীপের মহাপবিত্র গৌরব প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত রহিবে। বঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার আদিগুরু স্থান নবদ্বীপ।"

শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তিনি যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে তাঁর এই বর্ণনায়: "এই নবদ্বীপে মহা-মাননীয় হিন্দুধর্ম সংস্কারক সর্বজীবে সম দয়া, দয়ার অবতার, সর্বজীবে সম স্নেহ, জাতিভেদে বৈরক্তি, প্রেমের উৎস প্রেমের প্রস্রবণ, সত্য সৎ প্রেমবশে দুষ্কৃতিদলন, নিবারণ প্রেমরসে দুশ্চরিত্র নির্দয় পাষাণহৃদয় মানবগণের চরিত্র সংশোধক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মহোদয়ের জন্মস্থান লীলাস্থান।" শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা পরধর্মসহিষ্ণু এক উদারহৃদয় মানুষের পরিচয় তুলে ধরে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বিরোধ প্রসঙ্গে 'সৎ-প্রসঙ্গ' নামে মশাররফের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'কোহিনুর' পত্রিকায়। এই প্রবন্ধে মশাররফ আন্তরিক আবেগে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোনো গুরুতর সামাজিক বিবাদ-বিরোধ নেই এবং অভিন্ন শাসন ও অর্থনীতির অধীনে অবস্থান ও একই সমতলে বসবাসের কারণে এই ধরনের কলহ-বিদ্বেষ থাকা নিতান্তই অর্থহীন।

প্রথম জীবনে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ধারণায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী ছিলেন মশাররফ। বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্বের মধ্যে তিনি কখনও কোনো বিরোধ স্বীকার করেননি। ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন সোসাইটি' মাদ্রাসাগুলোর সার্থকতার পক্ষে জনমত সংগ্রহ করে। সমকালের একজন বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের অভিমতও সোসাইটি গ্রহণ করে, তাঁর মতামত কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হয়। এতে স্পষ্টতই দেখা যায়, মাদ্রাসা-শিক্ষা সংরক্ষণের ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন এবং ধর্মমিশ্রিত সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেন। এই মনোভাব থেকেই তিনি রচনা করেন 'মৌলুদ শরীফ', 'মুসলমানদের বাঙ্গালা শিক্ষা', 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হযরত বেলালের জীবনী' ইত্যাদি ধর্মাশ্রিত সাহিত্য। উল্লেখ্য, মশাররফ হোসেনের এই ধর্মমূলক রচনাগুলো তাঁর ধর্মপ্রাণ ও সমাজচিন্তারই প্রতিফলন।

মীর মশাররফ হোসেন রচিত সাহিত্যের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইসলাম ধর্মের মাধুর্যে শিল্পীমন মুগ্ধ ছিল। ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য তাঁর শিল্পীমনকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল, তারই ছায়া পড়েছে তাঁর রচনাতে। তাঁর রচনায় ইসলাম সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় না থাকলেও, ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে তিনি মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার জন্ম দেবার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশ সম্ভব নয়। অথচ এই ক্ষেত্রে মুসলমানেরা দারুণভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। তখন বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইসলামি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণত আরবি ফারসি মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ শুরু হত। পরে উর্দু মাতৃভাষা হলে মীর মশাররফ হোসেনের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে সমর্থন করেন। এবং ঘোষণা করেন, "বঙ্গভাষী মুসলমানের দেশভাষা মাতৃভাষা বাঙ্গালা।"

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত এবং তাঁর অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জানা যায়, ছোটোবেলায় তাঁর বাড়িতে পুথি পাঠের আসর বসত। তিনি ছিলেন তার একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা। এই সময়ে মুক্তারপুরে থাকাকালীন সময়ে মশাররফ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ নিয়মিত সংবাদ পাঠাতেন। তখন 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর সহকারী ছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২—১৯১৬)। এইসূত্রে ভুবনচন্দ্রের সাথে মশাররফ হোসেনের পত্রালাপ হয়। ভুবনচন্দ্র তাঁকে পত্রিকায় সংবাদ প্রেরণের জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এ-সম্পর্কে মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী'তে লেখেন: "বসিয়া বসিয়া কি করি? কলকাতার 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত। ... সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহা আছে। আমি অনেক সংবাদ তাঁহাদের কাগজে লিখিতাম। তাঁহারাও দয়া করিয়া ছাপাইতেন। আমাকে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন 'আমাদের কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা'। সাদাসিধেভাবে সংবাদ লিখিতাম। ভুবনবাবু কাটিয়া-ছাটিয়া প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া দিতেন।" মুক্তারপুরে থাকাকালীন সময়েই মশাররফ হোসেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথের (১৮৩৩—১৮৯৬) সান্নিধ্য লাভ করেন।

বলা যায়, এঁদের দু-জনের প্রেরণাতেই মশাররফের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি। হরিনাথ মজুমদারকে কেন্দ্র করে এ-সময় কুমারখালিতে গড়ে ওঠে এক 'কাঙাল-মণ্ডলী'। এই মণ্ডলীতে মীর মশাররফ হোসেন, জলধর সেন (১৮৬০—১৯৩৯), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২—১৯৩০), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০—১৯১৩) প্রমুখ ছিলেন। কুমারখালির নিকটবর্তী ভাঁড়ারা

গ্রাম থেকে বাউলশিরোমণি লালন এসে যোগ দিতেন এই চক্রে। এঁদের সংস্পর্শও মশাররফ হোসেনের সাহিত্যজীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মশাররফ হোসেনের বয়স যখন ষোলো বছর, তখন তিনি একবার পিতার সঙ্গে ঢাকায় বেড়াতে যান। ঢাকায় পিতৃবন্ধু ওয়াহেদ আলীর বাড়িতে জনৈক স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে মশাররফ পরিচিত হন। প্রথম জীবনে যাঁদের সাহায্য ও প্রেরণা তাঁর সাহিত্যজীবনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন, এই স্কুলশিক্ষক তাঁদের অন্যতম। মশাররফের সাথে আলাপে মুগ্ধ হয়ে সেই শিক্ষক তাঁকে 'কাদম্বরী' গ্রন্থ এবং 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে একটি বাংলা অভিধান উপহার দেন। দীর্ঘদিন এই পুস্তকদুটি ছিল তাঁর 'সঙ্গের সাথী'। মশাররফ হোসেনের প্রথম দিককার রচনায় এই 'সঙ্গের সাথী'র কিছু প্রভাব পড়েছে।

১৮৬৫ সালের মে মাসে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ মশাররফ হোসেনের 'মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি' নামে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরে (১২৭২) 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তাঁর 'গোলাপ' নামে একটা কবিতা ছাপা হয়। মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম জীবনের লেখা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও পাঠকসমাজে সমাদৃত। তিনি কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকারও লেখক ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ বা কবিতার নীচে নিজের নাম দিতেন না। লিখতেন— 'গৌরীতটবাসী মশা'। শিক্ষানবিশি পর্বের পর মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। এভাবে পুথিপাঠের আসরে বসবার অভিজ্ঞতা, বাউলগানের অধ্যাত্মচেতনা, সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা এবং জমিদারের কর্মচারী হিসেবে কার্যরত অবস্থায় অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে, তাদের বিচিত্র স্বাভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে যে-অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তারই প্রতিফলন তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে লক্ষ করা যায়। সাংবাদিক হিসেবে তিনি প্রথম জীবনে যে-কাজ শুরু করেছিলেন, তারই সূত্র ধরে তিনি একসময় পত্রিকা প্রকাশেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৮৭৪ সালে মীর মশাররফ হোসেনের জীবনে এক বিশেষ ঘটনা ঘটে। একদিন সাঁওতা গ্রামে অত্যন্ত সাধারণ এক বিধবা-কন্যা কালী ওরফে কুলসুমকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। এর চার বছর পর ঘটনাচক্রে কুলসুম মশাররফের অত্যন্ত কাছে এসে পড়ে। প্রথম স্ত্রী আজীজন্ নাহার ও আত্মীয়স্বজনদের মতের বিরুদ্ধে তিনি কুলসুমকে বিবাহ করেন (১৮৭৪)। আজীজন্ নাহারের সাথে বিয়ের (১৮৬৫) নয় বছর পর কুলসুম বিবির সঙ্গে বিবাহ মশাররফের দাম্পত্য ও সাহিত্যজীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

১ বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪) থেকে কুলসুমকে বিয়ে করার কিছুদিন আগে হুগলি কলেজের কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় প্রথম স্ত্রীর নামানুসারে মশাররফ হোসেন 'আজীজন্ নাহার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালি মুসলমানের সম্পাদনায় 'আজীজন্ নাহার' প্রথম পত্রিকা। কিন্তু এর কোনো কপি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সমকালের 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' এবং আরও কয়েকটি পত্রিকার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে শুধু নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তবে ১৯২০ সালের ৩০ মে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' কার্যালয়ে মীর মশাররফ হোসেনের প্রতিকৃতি স্থাপন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডা. আবদুল গফুর সিদ্দিকী মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, মীর মশাররফ হোসেন 'দুইখানি মাসিক ও একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়াছিলেন'।

হুগলি থেকে মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত ও প্রকাশিত দ্বিতীয় পত্রিকাটির নাম 'হুগলী বোধোদয়'। মীরের তৃতীয় পত্রিকাটির নাম 'হিতকরী'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। 'হিতকরী'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। মীরের পৌত্র মীর মোহাম্মদ হোসেন ওরফে সাদুল্লার নিজ সংগ্রহে 'হিতকরী'র কুড়িটি সংখ্যা সংরক্ষিত আছে।

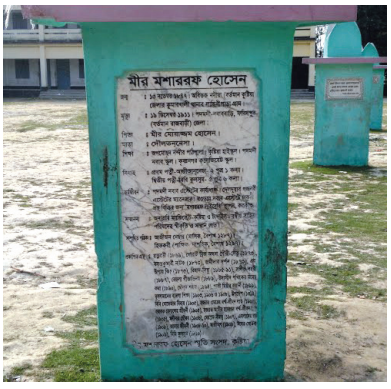

কুষ্টিয়ায় জন্মস্থানে স্মৃতিফলক।

মীর মশাররফ হোসেন নিজেই ছিলেন 'হিতকরী'র প্রধান লেখক। মীরের 'বিষাদ-সিন্ধু'র 'এজিদ বধ' পর্ব ছাপা হয় এই 'হিতকরী'তে। মীরের 'গোজীবন'-এর কিছু অংশ 'গোজীবন রক্ষা' নামে 'হিতকরী'তে ছাপা হয়। এই পত্রিকায় মীর 'আমাদের বাসভূমি' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনা লিখেছেন 'ম' ছদ্মনামে। এ-সময়ে বিলেতে অধ্যয়নরত মীরের ছোটোভাই মহতেশাম হোসেন, সেখান থেকে 'হিতকরী' পত্রিকার জন্য 'বিলাত প্রবাসীর পত্র' শিরোনামে লিখতেন। 'হিতকরী'তে লিখেছেন সমকালীন বেশ কয়েক জন খ্যাতিমান এবং পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করেছেন এমন অনেক লেখক। বরিশালের উকিল আবদুল ওয়াজেদের কন্যা ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩—১৯৬২) বোন আফ্‌জাকেন্নেছা খাতুনের লেখা 'করুণা আকর বিদ্যাসাগর' শীর্ষক একটি শোককবিতা (বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে) 'হিতকরী'তে ছাপা হয়।

১৮৮০ সালের ঘটনা। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদারের অনুরোধে ফিকিরচাঁদের দলের জন্যে মশাররফ একটি গান লেখেন। এই গান লেখার মধ্যে দিয়ে ফিকিরচাঁদের দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হরিনাথ মজুমদারের মাধ্যমে লালন ফকিরের সঙ্গেও মশাররফের পরিচয় ঘটে।

বাঙালি মুসলমান সমাজে সেকালে বাংলা গদ্যের ও আধুনিক সাহিত্যের চর্চা তেমন একটা ছিল না। তাই মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' যখন প্রকাশিত হয়, তখন 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, বইটি মুসলমানের ছদ্মনামে ভিন্ন লেখকের রচিত।

রাজেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রহস্যসন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রিকায় 'রত্নবতী'র আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, "রত্নবতী, কৌতুকাবহ উপন্যাস। শ্রীমীর মশাররফ হোসেন প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিও সমাদরের যোগ্য। ইহা একজন কৃতবিদ্য মুসলমান দ্বারা রচিত। অথচ ইহার রচনা কোনও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতের বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ফলে আমাদিগের বোধ ছিল মুসলমানেরা বাঙ্গালা লিখতে পারেন না, ...। কি বর্ণশুদ্ধি, কি ব্যাকরণ, কি রচনাকুশলতা, সকল বিষয়েই গ্রন্থের সাধুতা হইয়াছে, উহার নামপত্রে যাবনিক নামটি না থাকিলে আমরা অনায়াসে গ্রন্থখানি সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুর দ্বারা বিরচিত বলিয়া স্বীকার করিতাম।"

এই 'রত্নবতী'র মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান 'বাংলা লিখতে পারে না' বলে যে-ধারণা প্রচলিত ছিল, মশাররফ হোসেন সেই ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। বিষয়বস্তু যা-ই হোক-না-কেন "মশাররফ হোসেন সুললিত সাধু গদ্যে 'রত্নবতী' রচনা করে সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন যে, মুসলমান লেখকও বিশুদ্ধ গদ্যে রচনার ক্ষমতা রাখেন এবং তা কোনো গুণেই হিন্দু পণ্ডিত রচিত গদ্যের চেয়ে ন্যূন নাও হতে পারে। এখানেই মশাররফের প্রধান কৃতিত্ব। তিনি প্রথম আবির্ভাবেই নিজ রচনার গুণে হিন্দু সমাজের কাছ থেকে মুসলমান লেখকের বাংলা রচনার ক্ষমতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন।" এভাবে প্রথম গ্রন্থেই গদ্যশিল্পী হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত তাঁর অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জানা যায়, ছোটোবেলায় তাঁর বাড়িতে পুথি পাঠের আসর বসত। তিনি ছিলেন তার একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা।

আজও এমনই জনপ্রিয় যে, দুই বাংলায় 'বিষাদ-সিন্ধু'র নানা সংস্করণ হয়েই চলেছে।

পান। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "একদা মুসলমান সমাজ বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, কারণ এ-সাহিত্য প্রধানত হিন্দুর রচিত। মীর মশাররফ হোসেনই সর্বপ্রথম সে-প্রাচীর ভেঙে দিয়ে সাহিত্যের জগন্নাথক্ষেত্রে সকলকেই আহ্বান করেন।"

'রত্নবতী'র ভাষা কৃত্রিম সাধু বাংলা। যেমন, "রাজনন্দিনী যুবরাজ সুকুমারকে দর্শন করিবা মাত্র সগর্বে স্থায়ী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করি।" উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, "গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব, ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব।" গ্রন্থ প্রকাশের পর 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করে: "ইহার লেখা অতি সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটিতে বিশেষ চাতুর্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।" মীর মশাররফের প্রথম উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনায় তাঁর পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনেকটা স্পষ্ট বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। কিন্তু এটা ঠিক যে, 'রত্নবতী'তে ভাষার যে-নিদর্শন পাওয়া যায়, তা বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত ভাষা। তখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুখানা গ্রন্থ— 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়েছিল। 'রত্নবতী' প্রকাশের পর ওই বছরেরই শেষ দিকে (১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯) তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'মৃণালিনী' প্রকাশ পায়। কাজেই মশাররফ হোসেন ভাষার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী এমনটা বলা যায় না। তাঁদের উভয়ের ভাষার উৎস ছিল একই এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজের নিজের রচনাশৈলী সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন।

তৃতীয় গ্রন্থ 'বসন্তকুমারী' (১৫ মাঘ ১২৭৯)। এটি কোনো বাঙালি মুসলমানের লেখা প্রথম নাটক। নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক ও এগারোটি দৃশ্য। মোট আটটি গান এতে সংযোজিত হয়েছিল। এর কাহিনিতে হিন্দু পাত্র-পাত্রীদের বিবরণ আছে। আছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দূরত্ব কমানোর উদ্যোগ। কারণ সে-যুগের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন স্পষ্ট হলেও মশাররফ হিন্দু সমাজের রীতিনীতির প্রতিও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেছিলেন।

মশাররফ হোসেন বিজ্ঞাপনে বলেছেন, "আমার অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল। বাসন্তী সুসৌরভ এ কুসুমে আছে কি না, নিজে আমি সেটি জানি না। ... নাটক রচনায় এই আমার প্রথম উদ্যম; ইহাতে নানা দোষ অবশ্যম্ভাবী।" এজন্য লেখক পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 'বসন্তকুমারী' প্রকাশের পরে 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ফাল্গুন ১২৭৯) এর দীর্ঘ সমালোচনা হয়। তাতে মশাররফের ভাষার ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করা হয়। কিন্তু আঙ্গিকের ত্রুটি ও বিষয়ের তুচ্ছতার কথা বলা হয়: "আমাদিগের এই আশঙ্কা ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্য সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচনা করিয়া কখনো কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু 'বসন্তকুমারী' নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উহার প্রণয়কর্তা মুসলমান। নাটকখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদি নিগূঢ় বৃত্তান্তগুলি সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছেন। ... 'বসন্তকুমারী' নাটককার সাধু বাঙ্গালায় গ্রন্থ না লিখিয়া যদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তাঁহার গ্রন্থ অনাদরোপহৃত হইত সন্দেহ নাই। ... গল্প রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের কোনো প্রকার চাতুর্য প্রকাশ হইতেছে না। গ্রন্থখানি করুণরস প্রধান, কিন্তু যেরূপে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে, তাহাতে 'ফুললো আর মলো' এই যে প্রবাদবাক্যটি আছে, তাহাই আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। গ্রন্থকার তত ব্যস্ত না হইলে উপসংহারটি অধিকতর মনোহর হইত সন্দেহ নাই।" মশাররফ হোসেন নাটকখানি 'মহামহিমমিত্র' আবদুল লতিফ খান বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন। লাহিনীপাড়ায় মশাররফের বাড়িতে 'বসন্তকুমারী'র অভিনয় হত।

তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩)। এর মাধ্যমে সার্থক নাট্যকার হিসেবে মশাররফ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিন অঙ্কের এই নাটকে জমিদারদের প্রজাপীড়নের ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের সামাজিক অবস্থা এই নাটকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। নাটকটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অসাম্প্রদায়িকতা। জমিদার এবং প্রজার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখা তিনি টানেননি। আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুটি চরিত্র তিতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগীকে তিনি একই ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিসেবে দেখিয়েছেন। নাটকটি প্রকাশের আগে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। 'নীল দর্পণে'র মতো 'জমিদার দর্পণে'ও অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের কাহিনি আছে। এখানেও নাট্যকার অত্যাচারিতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। 'জমিদার দর্পণে' মীর মশাররফ বেশ আবেগময় ভাষা ব্যবহার করে পাঠকের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিলেন। সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হলেও এখনও পাঠকের হৃদয়কে এই বর্ণনা আলোড়িত করার ক্ষমতা রাখে। নাটকের অত্যাচারী চরিত্র জমিদার হায়ওয়ান আলির দ্বারা নির্যাতিতা নূরুন্নেহার মহারানি ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে যে-আকুতি জানিয়েছেন, তাতে বেশ আবেগময় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এমন একটি সংলাপের বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করলাম: "মা! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এই দৌরাত্ম্য হচ্ছে, তুমি কি তা জান্তে পাচ্ছো না? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না?"

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের তিন প্রধান মুসলমান সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করতে হলে মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ ও মোজাম্মেল হকের কথা বলতে হয়। এঁদের মস্ত কৃতিত্ব হল— তথাকথিত মুসলমানি বাংলা, যা ছিল দোভাষী পুথির ভাষা বা মিশ্র ভাষা, তা থেকে বাঙালি মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যকে উদ্ধার করা। আধুনিক বাংলা কবিতা ও গদ্যের মুসলমান সাহিত্যিকদের পুরোধা হিসেবে বিবেচিত মীর মশাররফ থেকেই এই কাজের সূচনা হয়েছিল। মীর মশাররফ বিশুদ্ধ বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমান সাহিত্যিকদের সামনে নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। 'জমিদার দর্পণ' প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শনে' যে-মন্তব্য করা হয়েছিল, তাতে এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়: "জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।" ■

(পরের সংখ্যায়)

খেলা ফুটবল কোটি কোটি মানুষের আবেগের কেন্দ্রে, তার তরঙ্গে স্পন্দিত হয় অগণন মুখ ও মন। সম্প্রতি শেষ হল বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪। বিচিত্র এই পৃথিবীতে ফুটবলেরও কম বৈচিত্র্য নেই। সেই বিচিত্রতার কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। সেসব নিয়ে এ-বারের এই পাতা। লিখেছেন

ফরিদা নাসরিন

বিশ্বকাপ ফুটবলের পাঁচকথা

ব্রাজিলে বিশ্বযুদ্ধ। ১২ জুন থেকে শুরু হয়ে শেষ হল ১৩ জুলাই। মোট বত্তিরিশটি দেশের এই যুদ্ধ চামড়ার একটা গোলককে নিয়ে, যাকে আমরা বলি ফুটবল। তাই এই যুদ্ধ উৎসবের আর আনন্দের। এ-বারের বিশ্বকাপে যে-বল নিয়ে খেলা হল, অ্যাডিডাস কোম্পানির সেই বলটির নাম ব্রাজুকা। বলটি অ্যাডিডাস নিজে তৈরি করেনি। করিয়েছে পাকিস্তানের শিয়ালকোট শহরের একটি বিখ্যাত ফুটবল তৈরির সংস্থাকে দিয়ে, যারা নাইকি বা অন্য কোম্পানির ফুটবলও তৈরি করে। সংস্থাটির নাম ফরোয়ার্ড স্পোর্টস। তারা ১৯৯৫ থেকে অ্যাডিডাসের ফুটবল তৈরি করছে এবং আগে চাম্পিয়নস লিগ, বুন্দেসলিগার মতো প্রতিযোগিতার ফুটবল তৈরি করেছে। সংস্থার সিইও খোয়াজা মাসুদ আখতার, যাঁর দিনরাত্রির স্বপ্ন ফরোয়ার্ড স্পোর্টস কোম্পানি (লিমিটেড)। সংস্থাটির আরও প্রসারে উঠে আসছে নতুন প্রজন্ম— তাঁর ছেলে খোয়াজা হাসান মাসুদ। বলে রাখা ভালো, শিয়ালকোট ভারতেরই লাগোয়া একটি পাকিস্তানি শহর, যেখানে বছরে ষাট মিলিয়ন ফুটবল তৈরি হয়, যা পৃথিবীর মোট ফুটবল উৎপাদনের ৭০ শতাংশ! ব্রাজুকা শব্দটির মানে? সারা দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশের ভাষা স্প্যানিস হলেও, ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগিজ। কিন্তু, ব্রাজুকাকে পর্তুগিজ শব্দ বলা যাবে না। শব্দটির আভিধানিক স্বীকৃতিও নেই। একান্তভাবেই এটি ব্রাজিলের লোকচলিত শব্দ, যার অর্থ ব্রাজিলের জাতীয় গর্ব। ব্রাজিলীয়দের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি পড়ে ফুটবলে। তাই এই শব্দটি ইঙ্গিত করছে তাদের আবেগ গর্ব আর শুভেচ্ছাকে।

আমরা সবাই জানি, বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ফিফা। ফিফার পুরো কথাটি কী? এটি ইংরেজিতে নয়, পাওয়া যাবে ফরাসি ভাষায়। কেন?

পৃথিবীর প্রথম ফুটবল সংগঠনটির নাম দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। এটা উনিশ শতকের মাঝপর্বের কথা। তখন ফুটবল জনপ্রিয় ছিল শুধুই ইংল্যান্ডে। তাই সে-দেশেই ছিল ওই সংস্থা। ১৮৭৩-এ গড়ে ওঠে দ্য স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। দেশে দেশে খেলাটি ছড়িয়ে পড়লে নানা সংস্থা তৈরি হয়। তখন একটা বিশ্বসংস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে আপত্তি করে ব্রিটেন। তাদের বক্তব্য ছিল, দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনই যথেষ্ট, কেননা, খেলাটা তাদেরই। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দেশগুলোর ভালো লাগেনি কথাটা। আর তাই ২১ মে ১৯০৪-এয় প্যারিসে আটটি দেশের ঐক্যমত্যে গঠিত হয় ফেডারেশন ইন্টারনাশিওনেল দে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (Federation Internationale de Football Association), যার ফরাসি উচ্চারণ বাংলায় লিখলে হবে অনেকটা ফিদিহ্যাসিউ আঁতারনাশিওনাল দ্য ফুতবল অ্যাসোসিয়েশঁ, সংক্ষেপে FIFA, বাংলায় ফিফা। প্রতিষ্ঠাতা দেশ ছিল ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং স্পেন। এখন সেই ফিফার সদস্য-দেশের সংখ্যা দু-শো আট।

দুই দেশের মধ্যে প্রথম ফুটবল ম্যাচ হয় এবং কোন দুটো দেশের মধ্যে?

ফরোয়ার্ড স্পোর্টস কোম্পানির মহিলা-কর্মীরা ফুটবল তৈরি করছেন।

১৮৭১ সালে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের। খেলাটি হয়েছিল গ্লাসগোর হ্যামিল্টন ক্রেসেন্ট, প্যার্ট্রিকে। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। ওই বছরেই দু-দেশের ফিরতি-ম্যাচ হয় ইংল্যান্ডে, দ্য ওভালে। সে-খেলায় ৪-২ গোলে জেতে ইংল্যান্ড।

১৯৩০ সালে শুরু হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলে এ-বারের মূল পর্বে কোন বত্তিরিশটি দেশ খেলবে, দুনিয়া জুড়ে দেশে দেশে তার নির্বাচনপর্ব চলেছে ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। সে এক এলাহি কাণ্ড! শেষ পর্যন্ত খেলা হল ব্রাজিলের বারোটি শহরে।

দু-শো আটটি সদস্য-দেশকে, অর্থাৎ বিশ্বকে মোট ছ-টি জোনে ভাগ করে ফিফা।

১. সিওএনএমইবিওএল (এটি একটি উচ্চারণগত সংক্ষিপ্ত রূপ, যার পুরো কথাটি হল— কনফেডারেশন অফ সাউথ আমেরিকান ফুটবল, স্প্যানিসে এবং পর্তুগিজে যে-কথাটি Confederacao Sul-Americana de futbol। Confederacao-এর কন, Americana-র মে, futbol-এর বল। কনমেবল।)।

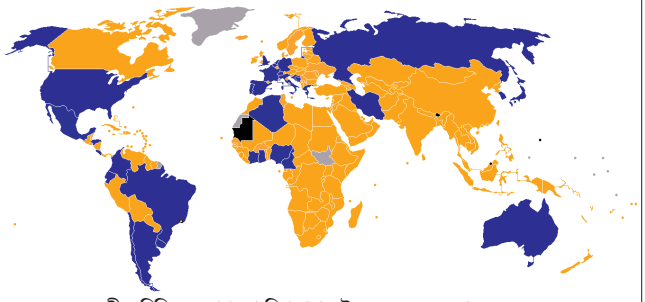

নীল চিহ্নিত দেশগুলো বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪-য় খেলেছে।

২. সিএএফ (দি কনফেডারেশন অফ আফ্রিকান ফুটবল)।

৩. ইউইএফএ (দি ইউনিয়ন অফ ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, উয়েফা নামেই বেশি পরিচিত।)।

৪. সিওএনসিএসিএফ (দি কনফেডারেশন অফ নর্থ সেন্ট্রাল আমেরিকান অ্যান্ড কলম্বিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, চলতি কথায় কনকাকাফ।)।

বিশ্বকাপ ফুটবলে এ-বারের মূল পর্বে কোন বত্তিরিশটি দেশ খেলবে, দুনিয়া জুড়ে দেশে দেশে তার নির্বাচনপর্ব চলেছে ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। সে এক এলাহি কাণ্ড! শেষ পর্যন্ত খেলা হল ব্রাজিলের বারোটি শহরে।

৫. এএফসি (এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন)।

৬. ওএফসি (ওসেনিয়া ফুটবল কনফেডারেশন)।

এ-বার ৬ নম্বর জোন থেকে কোনো দল মূল পর্বে নেই। ১ নম্বর জোন থেকে আছে মোট ছ-টি দল, ২ নম্বর থেকে পাঁচটি দল, ৩ নম্বর জোন থেকে সর্বাধিক তেরোটি দল, চার নম্বর থেকে চারটি এবং ৫ নম্বর থেকে চারটি দল। এই বত্তিরিশটি দেশের চূড়ান্ত লড়াই চলে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিলে।

এরিনা ফন্টে নোভা স্টেডিয়াম। ব্রাজিল।

দুঃখের কথা, এশিয়া থেকে এ-বার শেষ ষোলোয় একটাও দেশ ছিল না, যদিও ইরান প্রথম পর্বে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে। বিশেষ করে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই ফুটবলপ্রেমীদের বহুদিন মনে থাকবে। মেসির একক প্রয়াসে সে-দিন একমাত্র গোলটি না হলে ইরান হয়তো-বা বিশ্ব ফুটবলে বলবার মতো একটা জায়গায় এবার যেতে পারত।

তবে আসল যুদ্ধের শেষে শেষ হাসি হাসল মেসির আর্জেন্তিনাকে হারিয়ে জার্মান দল। আপাতত লড়াইয়ের সব উত্তেজনা ক্রমশ থিতিয়ে পড়ছে। এখন চারটি বছরের জন্য অপেক্ষা। পরের বিশ্বকাপ ২০১৮-য়, অনুষ্ঠিত হবে রাশিয়াতে। ■

লিওনেল মেসি। আর্জেন্তিনা।

আবদেল মুসা। নাইজেরিয়া।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগাল।

নেইমার। ব্রাজিল।

মেধার মূল্য জগৎময়। বন্ধুর মতো হাত মেধাবী আর মেধাবিনীর দিকে বাড়ানো আছে সবখানে। সে-হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে, পৌঁছোতে হবে সোনার শিখরে। যারা নিঃসহায়, তাদের চলার পথে আলোর শিখা নিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সুজন। স্কলারশিপ যেন এমনই বন্ধুর হাত আর সুজনের শিখা, যার সুলুকসন্ধান রয়েছে এই বিভাগে।

স্কলারশিপের সাত-সতেরো

মহম্মদ মহসীন আলি

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ

এই রাজ্যের দরিদ্র এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সাহায্যার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'মেধা তথা সংগতি বৃত্তি প্রকল্প'র আওতায় প্রতিবছর বৃত্তি প্রদান করে থাকে। মাধ্যমিকোত্তর নিয়মিত কোর্সের শিক্ষার্থীরা, যারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং এই রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষৎ কিংবা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত কোনো পরীক্ষায় পাস করে এই রাজ্যেরই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছে এবং যাদের পরিবারিক বার্ষিক মোট আয় ৮০ হাজার টাকার মধ্যে, তারা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। **ক. উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি (মাসিক ৫০০ টাকা):** মাধ্যমিক বা উল্লিখিত সমপর্যায়ের পরীক্ষায় ৭৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে (ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে)। যারা এ-বছরের মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে, তারাই কেবল আবেদন করতে পারবে। **খ. স্নাতক স্তরের বৃত্তি (মাসিক ৭৫০—১৫০০ টাকা পর্যন্ত):** উচ্চমাধ্যমিক বা উল্লিখিত সমপর্যায়ের পরীক্ষায় দুটি ভাষা বিষয় এবং তিনটি ইলেকটিভ বিষয় মিলিয়ে মোট অন্তত ৭৫ শতাংশ নম্বর আবেদনকারীকে পেতে হবে। এ-বছর যারা উচ্চমাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করে স্নাতক শিক্ষাক্রমের প্রথম বছরে ভর্তি হবে, তারাই কেবল আবেদন করতে পারবে। **গ. স্নাতকোত্তর স্তরের বৃত্তি (মাসিক ১২০০—১৪০০ টাকা পর্যন্ত):** স্নাতক স্তরে অনার্স বিষয়ে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। যারা এ-বছর অনার্স পাস করে স্নাতকোত্তর শ্রেণির প্রথম বছরে ভর্তি হবে, তারাই কেবল আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে। **ঘ. ডিপ্লোমা (পলিটেকনিক) স্তরের বৃত্তির জন্য (মাসিক ৭৫০ টাকা):** মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করে ডিপ্লোমা (পলিটেকনিক) শিক্ষাক্রমে প্রথম বছরে PHARMACY অথবা M.O.P.M.-এর ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় পাস করেছে যারা এবং W.B.S.C.V.E.T.-র (ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে ডিপ্লোমা (পলিটেকনিক) শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় বছরে ভর্তি হয়েছে যারা, তারাই কেবল দরখাস্ত করতে পারবে। ঐচ্ছিক বিষয় থাকলে, তার নম্বর বাদ দিয়ে উল্লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। **কারা কোথায় আবেদনপত্র জমা দেবে:** ১. একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা: Directorate of School Education (West Bengal), (Training & Examination Cell), Bikash Bhavan, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata 700 091। ২. কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল ছাড়া ইউ. জি. সি. অনুমোদিত অন্যান্য পেশাগত বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করবে। ঠিকানা: Directorate of Public Instruction (West Bengal), (Scholarship & Stipend Section), Bikash Bhavan, 9th Floor, North Wing, Salt Lake, Kolkata 700 091। ৩. মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পলিটেকনিক ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম বর্ষের অথবা দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা: Directorate of Technical Education & Training (West Bengal), Bikash Bhavan, 10th Floor, East Wing (North), Salt Lake, Kolkata 700 091। ৪. ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি এবং AICTE অনুমোদিত অন্যান্য পেশাগত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা: Directorate of Technical Education (West Bengal), Bikash Bhavan, 10th Floor, East Wing (South), Salt Lake, Kolkata 700 091। ৫. ডাক্তারি (MBBS, BDS, BHMS, BAMS) এবং নার্সিং বিষয়ক স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা: Directorate of Medical Education (West Bengal), Swasthya Bhavan, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700 091। ওয়েবসাইট (আবেদনপত্রের খসড়া এবং নির্দেশাবলি সংগ্রহের জন্য): 1. www.wbgov.com 2. www.banglarmukh.com 3.www.tathyabangla.org.in 4.www.higherednwb.net।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) প্রদত্ত প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. আবেদককে পশ্চিমবঙ্গো বসবাসকারী ভারতের নাগরিক হতে হবে। খ. পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে। গ. সর্বশেষ ফাইনাল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। **শর্তাবলি:** ক. আবেদককে অবশ্যই সংখ্যালঘু (মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ

এবং পার্সি) সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে। খ. তার পারিবারিক বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। গ. সর্বশেষ ফাইনাল পরীক্ষার মার্কশিটের প্রত্যয়িত ফোটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। **বিবরণ:** বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.wbmdfc.org) থেকে আবেদনপত্রের খসড়া এবং সবিস্তার নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) প্রদত্ত পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. পূর্বোক্ত স্কলারশিপের মতো, কেবল পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় ২ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে। **শর্তাবলি:** ক. যোগ্য ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীকে অনলাইন (www. momascholarship.gov.in)-এ আবেদন করতে হবে। খ. আবেদনপত্র সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে জমা হয়ে গেলে, ওই আবেদনপত্রের একটি প্রিন্ট নিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর করে দরকারি নথিপত্রসহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। গ. ইলেকট্রনিক্যালি অর্থ পাঠানো যায়, এরকম একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আবেদনকারীর নামে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ঘ. পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী ঠিকানা অথচ বাইরের রাজ্যে পাঠরত কোনো ছাত্রছাত্রীকে WBMDFC দ্বারা সরবরাহকৃত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে। **বিবরণ:** ক. আবেদনকারীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে। খ. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.momascholarship.gov.in) থেকে আবেদনপত্রের খসড়া এবং সবিস্তার নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে। গ. ৩০ শতাংশ স্কলারশিপ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত।

মিনিস্ট্রি অফ মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স (MOMA)-এর উদ্যোগে রাজ্য মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে প্রদত্ত মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. পূর্বোক্ত স্কলারশিপের মতো। খ. পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে। গ. পূর্বোক্ত স্কলারশিপের মতো। ঘ. আবেদনকারীর বয়স আবেদন করার বছরের ১ এপ্রিল পর্যন্ত ১৬ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। **শর্তাবলি:** ক. অনলাইন (www.momascholarship.gov.in)-এ আবেদন করতে হবে। এবং অন্য শর্তগুলি এর আগের স্কলারশিপের মতো। **বিবরণ:** ক. ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ IIT, IIM, NIT ইত্যাদির মতো ৮৫-টি প্রতিষ্ঠান, যেখানে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা পুরো কোর্সের খরচ পেতে পারে। খ. উপরিউক্ত ৮৫-টি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা কোর্সের বিভিন্নতা এবং খরচ অনুযায়ী হস্টেলে থাকলে সব থেকে বেশি ৩০ হাজার টাকা এবং ডে-স্কলার হলে সব থেকে বেশি ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতে পারে। ঘ. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.momascholarship.gov.in) থেকে আবেদনপত্রের খসড়া এবং সবিস্তার নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে। ঙ. ৩০ শতাংশ স্কলারশিপ ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) প্রদত্ত শিক্ষাঋণ (সুদবিহীন)

যোগ্যতা: ক. চাকরির উচ্চ সম্ভাবনা আছে এমন কোর্স, যেমন প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল কোর্স, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট/পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স অথবা শর্ট টার্ম কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে। খ. আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিক হতে হবে। **বিবরণ:** ক. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.wbmdfc.org)-এর মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। খ. ওই ওয়েবসাইট থেকেই সমস্ত নির্দেশাবলি এবং তথ্য জানা যাবে। গ. ঠিকানা: DD-27/E, Salt Lake City, Sector I, Kolkata 700 064।

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর প্রদত্ত প্রি-ম্যাট্রিক ওবিসি স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভারতের নাগরিক হতে হবে। খ. পারিবারিক মোট আয় বার্ষিক ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে। গ. অন্য কোনো সরকারি স্কলারশিপ গ্রহণ করলে, এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা যাবে না। **শর্তাবলি:** ক. আবেদনপত্রের সঙ্গে পারিবারিক মোট বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র দিতে হবে। খ. বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার থাকতে হবে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ। গ. নির্দেশনপত্রে স্বাক্ষরকারীগণের সিলমোহর না থাকলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। ঘ. একই শ্রেণিতে একবার অনুত্তীর্ণ হলে বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। ঙ. আবেদনকারীর পিতা জীবিত না থাকলে এবং মাতা জীবিত থাকলে মাতা স্বতঃসিদ্ধভাবে অভিভাবিকা হবেন। পিতা এবং মাতা উভয়েই জীবিত না থাকলে বৈধ রক্তের সম্পর্কীয় নিকট-আত্মীয় অভিভাবক হবেন। চ. মহকুমা শাসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জাতিগত শংসাপত্রের প্রত্যয়িত ফোটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে। **বিবরণ:** ক. বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক ৪০ টাকা হিসেবে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ১০ মাসের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। খ. হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক ২০০ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণির জন্য মাসিক ২৫০ টাকা হিসেবে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ১০ মাসের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। গ. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.anagrasarkalyan.gov.in) থেকে আবেদনপত্র ও নির্দেশাবলি পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর প্রদত্ত পোস্ট-ম্যাট্রিক ওবিসি স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস করে যথাক্রমে একাদশ এবং স্নাতক প্রথম বর্ষে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারে। তা ছাড়া স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারে। খ. এবং গ. এর আগের স্কলারশিপের মতো। ঘ. উল্লিখিত কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে না: টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, এয়ারক্র্যাফট মেইনটেনেন্স কোর্স, প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স কোর্স, যেকোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি কোর্স ইত্যাদি। **শর্তাবলি:** ক. কোনো ছাত্রছাত্রী যদি এই স্কলারশিপ পায়, তাহলে সে একই ধরনের অন্য কোর্সের জন্য এই স্কলারশিপ পাবে না। খ. কোনো ছাত্রছাত্রী পূর্বে এই স্কলারশিপ পেয়ে থাকলে, উচ্চতর কোনো কোর্সের জন্য নতুনভাবে আবেদন করতে হবে। গ. আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভারতের নাগরিক হতে হবে। **বিবরণ:** ক. বাড়ি থেকে পড়াশোনা করলে কোর্সের বিভিন্নতা অনুযায়ী মেইনটেনেন্স খরচ বাবদ মাসে ৯০ টাকা থেকে ১৯০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। খ. হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করলে কোর্সের বিভিন্নতা অনুযায়ী মাসে ১৫০ থেকে ৪২৫ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে। গ. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.anagrasarkalyan.gov.in) থেকে আবেদনপত্র ও নির্দেশাবলি সংগ্রহ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর প্রদত্ত ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাঋণ (সুদবিহীন)

যোগ্যতা: ক. আবেদনকারীকে সরকার অনুমোদিত যেকোনো প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল কোর্সের ছাত্রছাত্রী হতে হবে। খ. পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় গ্রাম এলাকার জন্য ৪০ হাজার টাকা এবং শহর এলাকার জন্য ৫৫ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে। গ. আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে। **বিবরণ:** আবেদনকারী কোর্সের বিভিন্নতা এবং খরচ অনুযায়ী সবথেকে বেশি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারে। **যোগাযোগ:** পশ্চিমবঙ্গ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন, ১২ বি বা দি বাগ (ইস্ট), হেমন্ত ভবন, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা ৭০০ ০০১। **ওয়েবসাইট:** www.wbbcdfc.org।

এফএইএ ফাউন্ডেশন ফর অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্স অ্যান্ড অ্যাসেস স্কলারশিপ

অনুমোদিত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১০+২) উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করলে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারে। আর্টস, কমার্স, সায়েন্স, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্য কোনো টেকনিক্যাল বা প্রফেশনাল কোর্সে পড়াশোনা করলে যেকোনো ছাত্রছাত্রী এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারে। প্রতিবছর প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। জুন মাসের প্রথম দিকে স্কলারশিপের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.faeaindia.org)-এ আবেদনপত্রের খসড়া এবং নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে। **যোগাযোগ:** Foundation for Academic Excellence and Access (FAEA), C-25 Qutab Institutional Area, New Mehrauli Road, New Delhi 110016।

মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত যেকোনো বোর্ড থেকে ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ ক্লাস টেন (মাধ্যমিক) উত্তীর্ণ শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রীরাই আবেদন করতে পারবে। খ. অবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে। গ. পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় ১ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে। **শর্তাবলি:** ক. মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হয়ে আবেদনকারীকে অবশ্যই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হবে। খ. অন্য স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্রী এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে না। গ. আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পারিবারিক বার্ষিক আয়ের প্রমাণপত্র সংযোজন করতে হবে। ঘ. নির্দেশ অনুযায়ী নির্ভুলভাবে সমস্ত তথ্য দিয়ে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: Maulana Azad Education Foundation, (Ministry of Minority Affairs, Govt. of India), Social Justice Service Centre, Chelmsford Road, New Delhi 110055। **বিবরণ:** ক. এটি একটি এককালীন বৃত্তি। খ. মোট ১২ হাজার টাকা দুটি ভাগে প্রদান করা হয়। আবেদন অনুমোদনের সাথে-সাথেই ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয় এবং একাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র জমা দিলে বাকি ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। গ. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.maef.nic.in) থেকে আবেদনপত্রের খসড়া সংগ্রহ করা যাবে।

ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড প্রদত্ত ইন্ডিয়ান অয়েল অ্যাকাডেমিক স্কলারশিপ

যোগ্যতা: ক. MBBS, Engineering, MBA এবং 10+/ITI পাঠরত ছাত্রছাত্রী আবেদন করতে পারে। খ. উপরিউক্ত প্রতিটি কোর্স ফুল টাইম কোর্স হতে হবে। গ. আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় ১ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে। ঘ. MBBS, Engineering বা MBA-র ছাত্রছাত্রী হলে, বারো ক্লাসে কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হতে হবে। এসসি, এসটি, ওবিসি বা ছাত্রী হলে অন্তত ৬০ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। 10+/ITI-এর ছাত্রছাত্রী হলে ওপরের ক্রম অনুযায়ী একই নম্বর পেতে হবে। **শর্তাবলি:** ক. আবেদনকারী যে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত, তা অবশ্যই MCI/AICTE/State Education Board/ State Govt./ ICSE/ISC/CBSE/Central Govt./ Association of Indian University-র অনুমোদনপ্রাপ্ত হতে হবে। খ. উপরিউক্ত কোর্সগুলিতে পাঠরত প্রথম বর্ষের অন্য স্কলারশিপ না পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাই একমাত্র আবেদন করতে পারবে। গ. আবেদনকারীর নামে যেকোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ঘ. আবেদন করার বছরের ৩ জুলাই পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩ বছর, এসসি/এসটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫ বছর এবং প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় রয়েছে। ঙ. IOCL-এ কর্মরত বা এরসঙ্গে যুক্ত কর্মচারীর ছেলেমেয়েরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে না। ছ. পারিবারিক আয়ের শংসাপত্র কোনোরকম এফিডেভিটের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে না। আয়ের শংসাপত্র নির্দিষ্ট রেভিনিউ অথরিটির কাছ থেকেই নিতে হবে। **বিবরণ:** ক. 10+/ITI পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসে ১ হাজার টাকা, MBBS, Engineering এবং MBA পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে। খ. আবেদন করার জন্য বিভাগীয় ওয়েবসাইট (http://www.eonlineapply.com/ioclscholar2013/default.aspx)-এ লগিং অন করতে হবে। **যোগাযোগ:** M/S ACE Consultants, New Delhi।

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল কোর্সে পড়াশোনা করলে, এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি বছর প্রায় ৫০০ জনকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। প্রফেশনাল কোর্সে পাঠরত শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী বাড়ি থেকে পড়াশোনা করলে মাসিক ৭০০ টাকা এবং হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করলে মাসিক ১ হাজার টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হয়। ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্সে পাঠরত প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী বাড়ি থেকে পড়াশোনা করলে মাসিক ৪০০ টাকা এবং হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করলে ৭০০ টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হয়। প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। আবেদনপত্রের

খসড়া এবং নির্দেশাবলি বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.nhfdc.org)-এ পাওয়া যাবে। **যোগাযোগ:** NHFDC, Red Cross Bhawan, Sector 12, Faridabad 121007।

নর্থ-সাউথ ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ

রাজ্য স্তরে বা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথমদিকের স্থানাধিকারী ১০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই কেবল এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে। গ্রাম্য এলাকার ছাত্রছাত্রী, প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রীদের জন্য উপরিউক্ত শর্তগুলিতে ৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.northsouth.org/public/india/Doc/NSF2013.pdf) থেকে আবেদনপত্রের খসড়া এবং নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে।

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রদত্ত আইডিবি লোন স্কলারশিপ (সুদমুক্ত)

যোগ্যতা: ক. যেসমস্ত ছাত্রছাত্রী মেডিসিন (এমবিবিএস, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি, হোমিয়োপ্যাথি), ডেন্টিসট্রি, ফার্মাসি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ফিজিয়োথেরাপি, নার্সিং, ল্যাব টেকনিশিয়ান,বায়োটেকনোলজি,মাইক্রোবায়োলজি,ইঞ্জিনিয়ারিং(সবশাখা), এগ্রিকালচার, ফিশারিজ, ফরেস্ট্রি, ফুড টেকনোলজি, ব্যাচেলার অব ল এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়াশোনা করছে, তারা আবেদন করতে পারে। খ. আবেদনকারীর বয়ঃসীমা ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। গ. সিনিয়র সেকেন্ডারি/এইচএসসি/প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি/ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে গড়ে অন্তত ৭০ শতাংশ নম্বর থাকলে আবেদন করা যাবে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল এবং তামিলনাড়ুর ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওইসব বিষয়ে গড়ে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। বিবিএ + এমবিএ (ইন্টিগ্রেটেড) এবং ব্যাচেলার অব ল-তে পাঠরত আবেদনকারীদের সিনিয়র সেকেন্ডারি বা সমতুল্য (১০+২) পরীক্ষায় ইংরেজি এবং অপশনাল/ ইলেকটিভ বিষয়ে কমপক্ষে গড়ে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। **শর্তাবলি:** ক. এটি একটি লোন স্কলারশিপ, সুতরাং প্রতিটি উপভোক্তাকে কোর্স সম্পূর্ণ হওয়ার পরে পূর্ণ অর্থ সহজ কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে। খ. এই লোন স্কলারশিপ উপভোক্তা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে নিজ উপার্জনকর্মের সাথে সাথে সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে। গ. সব তথ্য ইংরেজি ভাষায় দিতে হবে। ঘ. আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট তারিখে ইন্টারভিউয়ে হাজির হতে হবে। ঙ. উক্ত কোর্সে পাঠরত কেবলমাত্র প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাই আবেদন করতে পারবে। চ. আবেদনকারীর পারিবারিক আর্থিক অবস্থা, এইচএসসি/এসএসসি/প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ফল এবং পরিবারের সদস্য-সংখ্যার ওপর বিবেচনা করে সঠিক স্কলারশিপপ্রাপক নির্বাচন করা হয়। ছ. স্নাতকোত্তর পাঠরত ছাত্রছাত্রী, বিদেশে পাঠরত ছাত্রছাত্রী এবং যেসমস্ত ছাত্রছাত্রী ডিপ্লোমা করে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হয়েছে, তারা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে না। **বিবরণ:** ক. ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বাবদ খরচের প্রায় সবটাই দেওয়া হয়। খ. বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.metdelhi.org /www.isdb.org) থেকে আবেদনপত্রের খসড়া পাওয়া যাবে। **যোগাযোগ:** E3 Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi 110025, India।

উদয়ের পথে স্কলারশিপ

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, শুধুমাত্র ডাক্তারিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। উচ্চমাধ্যমিক (১০+২)-এর ফল, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের র‍্যাঙ্ক এবং পারিবারিক বার্ষিক মোট আয়ের ওপর ভিত্তি করে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের ফল প্রকাশের পরেই যোগাযোগ করতে হবে। **যোগাযোগ:** Shri Akshay Mohanty, Co-Ordinator, Udayer Pathe, Rabindra Nath Tagore International Institution of Cardiac Sciences, 124 Mukundapur, E M Bypass, Kolkata 700 099।

সীতারাম জিন্দাল স্কলারশিপ

অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে বিপিএল পরিবারের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রীরা, ITI পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এবং যেকোনো শাখায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদনকারী ছাত্রী হলে মাধ্যমিক (১০) এবং উচ্চমাধ্যমিক (১০+২)-এ ৭০ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হতে হবে। ছাত্র হলে মাধ্যমিক (১০) এবং উচ্চমাধ্যমিক (১০+২)-এ ৭৫ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হতে হবে। কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবেদনকারী ছাত্রী হলে ৬০ শতাংশ এবং আবেদনকারী ছাত্র হলে ৭০ শতাংশ নম্বরসহ উত্তীর্ণ হলেই চলবে। আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় ২ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে। আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ ৩০ বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে। বিভাগীয় ওয়েবসাইট (www.sitaramjindalfoun dation.org/scholarship.php)-এ আবেদনপত্রের খসড়া এবং নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে।

কামদাকিঙ্কর মেমোরিয়াল সোসাইটি প্রদত্ত স্কলারশিপ

ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বর্গত পিতার নামাঙ্কিত কামদাকিঙ্কর মেমোরিয়াল সোসাইটি প্রতিবছর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে পাস করা ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের বছরে ১২ হাজার টাকা শর্তহীন বৃত্তি দেয়। ডাক্তারি পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সর্বাধিক ৫ বছর এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সর্বাধিক ৪ বছর পর্যন্ত এই বৃত্তি দেওয়া হয়। সাদা কাগজে সমস্ত তথ্য দিয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। **ঠিকানা:** পলাশ ব্যানার্জি, ৪০০/৫ রাধা হাউজিং, পোস্ট: ঢালুয়া, দাসপাড়া, কলকাতা ৭০০ ১৫২। (আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে কলেজে ভর্তির রসিদের জেরক্স কপি, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের র‍্যাঙ্ক কার্ডের জেরক্স কপি, পারিবারিক বার্ষিক মোট আয় এবং স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।) ■

দুনিয়ায় এমন জাতি নেই, যাদের নিজস্ব রূপকথা নেই। এই পাতায় থাকছে দেশ-বিদেশের সচিত্র রূপকথা। এই সংখ্যায় ইউক্রেনের একটি গল্প।

মায়া-ডিম

সংগ্রাহক ভ্লাদিমির বইকো
ছবি মোহনলাল মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগে, কেউ জানে না কবে, ভরত পাখি ছিল রাজা, আর মূষিকা ছিল রানি। নিজেদের মাঠ ছিল তাদের। গম বুনল তাতে। গম ফলার পর দানা ভাগাভাগি করতে লাগল। কেবল একটা দানা রয়ে গেল বাড়তি। মূষিকা বলল, 'ওটা আমিই নিই!'

কিন্তু ভরত বলে, 'না, ওটা আমার।'

'বেশ, আধাআধি চেরা যাক।'

ভরত পাখি রাজি হল। ভাঙার জন্য দানায় কামড় দিয়েই-না মূষিকা সেটা মুখে করে পালাল গর্তে। ভরত পাখি তখন জিগির দিল, মূষিকা রানির সঙ্গে লড়াইয়ে জড়ো করল বনের সব পাখি, রানি জড়ো করল সব পশুদের। যুদ্ধ বাধল। লড়াই চলল সারাদিন, সন্ধেয় জিরিয়ে নেবার জন্য থামল সবাই। মূষিকা রানি তাকিয়ে দেখে, ডাঁশেরা লড়াইয়ে আসেনি। তখন হুকুম করল তাদের আসতে। ঝাঁক বেঁধে উড়ে এল ডাঁশেরা। মূষিকা হুকুম দিল, রাতে পাখিদের পালক যেন কামড়ে কামড়ে খসিয়ে দেয়।

পরের দিন ভোর হতেই রানি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঠো সবাই, লড়াই!'

পাখিরা উঠতে গেল, কিন্তু উড়তে আর পারে না, পড়ে যায় মাটিতে, জন্তুরা তাদের কামড়ে খায়। জয় হল রানির।

তবে একটা ইগল পাখি দেখে, ব্যাপার সুবিধের নয়, বসেই থেকে গেছে, ওড়ে না। এই সময় এল শিকারি। দেখে, গাছে বসে আছে ইগল, অমনি তাক করল তার দিকে! আর ইগল কাকুতিমিনতি করে, 'মেরো না আমায়, জোয়ান শিকারি, আমি তোমার খুব কাজে লাগব।'

আরেক বার তাক করল শিকারি, ইগল ফের মিনতি করে, 'নিয়ে চলো আমায়, সেবাশুশ্রূষা করো, দেখবে তখন কেমন তোমার কাজে লাগি।'

আরও একবার তাক করল শিকারি, ইগলও মিনতি করতে লাগল, 'না-না, আমায় মেরো না, ভারি কাজে লাগব তোমার!'

তার কথায় বিশ্বাস হল শিকারির। গাছে উঠে তাকে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরল। ইগল তাকে বলল, 'তুমি আমায় মাংস খাইয়ে যাও যতদিন-না পাখায় আমার জোর পাচ্ছি।'

ওদিকে শিকারির তো ছিল দুটি গোরু আর একটি ষাঁড়। একটা গোরু সে কাটল। সারা বছর ধরে ইগল খেল সেটাকে। ইগল বলল, 'ছেড়ে দাও আমায়, উড়ে দেখি, পাখা আমার গজাল কি না।'

তা শিকারি তাকে ছেড়ে দিল। ওড়ে ইগল, কেবলই ওড়ে, দুপুরে ফিরল বাড়িতে। বলল, 'এখনও জোর আমার কম! অন্য গোরুটাও কাটো!'

শিকারি তার কথামতো দ্বিতীয় গোরুটাও জবাই করল। এক বছর ধরে ইগল খেল সেটা। তা খাবার পর ফের উড়ে গেল। উড়ে চলল প্রায় গোটা দিন, ফিরল সন্ধেয়, বলল, 'এবার ষাঁড়টাকে কাটো।'

শিকারি ভাবে, 'কী করা যায়? কাটব, না কি কাটব না?' তারপর বলল, 'সবই গেল তো এটাও যাক!'

জবাই করল ষাঁড়টাকে। এক বছর ধরে ইগল খেল সেটা, তারপর কী ওড়াই-না উড়ল! ওই উঁচুতে, উঁচুতে, একেবারে মেঘের নীচে। যখন ফিরল, শিকারিকে বলল, 'ধন্যি তোমায়, ভালোমানুষের পো, যত্ন-আত্তি করেছ আমার, এবার আমার পিঠে চেপে বসো।'

শিকারি শুধোয়, 'কেন?'

ইগল বলে, 'বলছি বসো!'

শিকারিও বসল। ইগল তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নীল মেঘের ওপারে, তারপর নীচে ফেলে দিল। ইগল উড়ছিল, পড়ন্ত অবস্থায় ধরে ফেলল শিকারিকে, বলল, 'তা কীরকম লাগল?'

শিকারি বলল, 'প্রায় মরো-মরো।'

ইগল বলল, 'তুমি যখন তাক করেছিলে, আমারও তেমনি লেগেছিল।' পরে বলল, 'আবার উঠে বসো।'

ইগল ফের তাকে নীল মেঘের ওপারে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল মাটিতে, ফের ধরে ফেলল মাটিতে পড়বার মুখে। জিজ্ঞেস করল, 'তা কেমন লাগল?'

শিকারি বলল, 'মনে হচ্ছিল আমার হাড়গোড় সব খসে পড়েছে।'

ইগল তখন বলল, 'আমারও তাই মনে হয়েছিল, যখন আরেক বার তুমি তাক করেছিলে। নাও, বসো আরেক বার।'

শিকারি বসল। ইগল তাকে আরেক বার নিয়ে গেল নীল মেঘের ওপারে। নীচে ফেলে দিয়ে ধরল তাকে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়ার মুখে। ধরে ফেলে তারপর শুধোয়, 'তা কেমন লাগল?'

'মনে হচ্ছিল, আমি আর বেঁচে নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল, যখন তিন বারের বার তাক করেছিলে আমায়।' তারপর বলল, 'এবার আমাদের শোধবোধ হয়ে গেল। ওঠো আমার পিঠে, উড়ে যাব বাড়িতে, আমার রাজ্যে।'

উড়ছে তারা, উড়ছে, উড়ে উড়ে পৌঁছোল ইগলের কাকার কাছে। ইগল বলল, 'বাড়ির ভেতরে যাও, যখন জিজ্ঞেস করবে, "আমাদের ভাইপোকে দেখেছ?" বলবে, "মায়া-ডিম দিলেই তাকে এনে দেব।" '

শিকারি ঢুকল বাড়ির ভেতর, ওরা তাকে শুধাল, 'নিজের ইচ্ছায় এলে, না কি অনিচ্ছায় এলে?'

ও বলল 'সুজন কসাক সর্বদাই নিজের ইচ্ছেয় চলে।'

ওরা শুধাল, 'আমাদের ভাইপোকে দেখেছ কোথাও? তিন বছর হল যুদ্ধে গিয়েছিল, আজ অবধি তার কোনো খবর নেই, পাত্তা নেই।'

শিকারি বলল, 'মায়া-ডিম দাও, এক্ষুনি ওকে এনে দিচ্ছি।'

ওরা বলল, 'তোমায় মায়া-ডিম দেবার চেয়ে কখনও ওর দেখা না পাওয়াও বরং ভালো।'

তখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ইগলকে বলল, 'ওরা জবাব দিল, "মায়া-ডিম দেবার চেয়ে কখনও ওর দেখা না পাওয়াও বরং ভালো।" '

ইগল বলল, 'আরও ওড়া যাক।'

উড়ছে ওরা, উড়ছে, উড়ে উড়ে এল ভাইয়ের কাছে। সেখানেও একই ব্যাপার, যা ঘটেছিল কাকার বাড়িতে, মায়া-ডিম শিকারি পেল না। তখন উড়ে গেল ইগলের বাবার কাছে। শিকারিকে ইগল বলল, 'বাড়ির ভেতর যাও, আমার সম্পর্কে যেই জিজ্ঞেস করবে, বলো, "মায়া-ডিম দাও, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।" '

ভেতরে ঢুকল শিকারি, তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইচ্ছায় এলে না কি অনিচ্ছায়?'

সে জবাব দিল, 'সুজন কসাক সর্বদাই নিজের ইচ্ছেই চলে।'

ফের তারা শুধায়, 'আমাদের ছেলেটাকে দেখেছ? যুদ্ধে গিয়েছিল, চার বছর কেটে গেল। মারা পড়ল নাকি?'

শিকারি বলল, 'মায়া-ডিম দাও, এক্ষুনি ওকে এনে দিচ্ছি।'

ইগলের বাপ তখন বলল, 'ডিম দিয়ে তোমার কী হবে? তোমায় বরং টাকা দেব অনেক।'

শিকারি কিন্তু বলে, 'টাকা আমার চাই না। মায়া-ডিম দাও!'

'বেশ, মায়া-ডিম দিচ্ছি, কেবল তাড়াতাড়ি ছেলেকে এনে দাও।'

তা শিকারি তো ইগলকে নিয়ে এল বাড়িতে । সবার ভারি আনন্দ, শিকারিকে মায়া-ডিম দিয়ে বলল, 'পথে ভেঙো না কিন্তু। বাড়ি গিয়ে চারিদিকে মস্ত বেড়া তুলে তারপর ভেঙো।'

বাড়ি চলল শিকারি। যেতে, যেতে, যেতে, বড়ো তেষ্টা পেল। পাওয়া গেল একটা কুয়ো, জল খেতে যাচ্ছে, অমনি বালতিতে লেগে ভেঙে গেল ডিমটা। আর ডিম থেকে বেরিয়ে আসতে থাকল গোরুর পাল। বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। পালকে তাড়া দেয় শিকারি, এদিক থেকে তাড়া দেয়, ওদিক থেকে তাড়া দেয়, কিছুই হয় না— গোটা পাল ছুটে পালায়। চেঁচায় বেচারি, সামলাতে পারে না কিছুতেই। দেখে, এক নাগিনি আসছে।

'পালটাকে যদি ডিমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, কী আমায় দেবে?'

শিকারি বলল, 'কী তুমি চাও?'

নাগিনি বলল, 'তুমি না-থাকতে বাড়িতে নতুন যা এসেছে, সেটা আমায় দেবে?'

ও বলল, 'দেব।'

নাগিনি গোরুর পাল তাড়িয়ে ডিমের ভেতর ঢুকিয়ে, ভালো করে খোলা বন্ধ করে দিল তার হাতে। বাড়ি এল শিকারি, এদিকে সে বাড়ি না-থাকার সময় ছেলে হয়েছে তার। মাথায় হাত দিল শিকারি, 'আমি যে ছেলে— তোকে দিয়ে রেখেছি নাগিনির কাছে!'

দুঃখ করল শিকারি আর তার বউ, ঠিক করল, 'কী আর করা যাবে! চোখের জলে তো কোনো সুরাহা হবে না, বেঁচে থাকতে হবে কোনোরকমে।'

মস্ত বেড়া তুলল সে, ডিমটা ভাঙল, ছেড়ে দিল গোরুর পাল, বড়োলোক হয়ে গেল তারা। দিন কেটে যায়, বড়ো হয়ে উঠল ছেলে। একদিন সে বলল, 'বাবা, তুমি আমায় নাগিনিকে দিয়েছ। যাব তার কাছে, যা হবার হোক।'

গেল সে নাগিনির কাছে। সে আসতে, নাগিনি তাকে বলল, 'আমার তিনটে কাজ করে দিলে তোকে বাড়ি যেতে দেব। না করলে খেয়ে ফেলব।'

নাগিনির বাড়ির কাছে ছিল প্রকাণ্ড এক মাঠ, শেষ দেখা যায় না। নাগিনি বলল, 'এই মাঠ তুই এক রাত্তিরের মধ্যে পরিষ্কার করে খুঁড়ে গম বুনবি, ফসল তুলে গাদি দিবি। আর-এক রাত্তিরের মধ্যেই সে-গম থেকে আমার জন্যে রুটি বানাবি। ঘুম থেকে যখন উঠব, টেবিলে যেন রুটি তৈরি থাকে।'

চলল নওল কিশোর, মাথা নুয়ে পড়েছে। কাছেই একটা থাম, ইট গেঁথে তার মধ্যে থাকত নাগিনি-কন্যে। থামের কাছে গিয়ে সে তাতে ঠেস দিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। তাতে কন্যে তাকে শুধায়, 'কাঁদছ কেন?'

ছেলে বলে, 'না কেঁদে উপায় কী! নাগিনি আমায় যা করতে বলেছে, সারা জীবনেও তা করে উঠতে পারব না, এক রাত্তিরে তো দূরের কথা।'

কন্যে আবার শুধায়, 'কী করতে বলেছে তোমায়?'

তা সব কথা সে জানাল। কন্যে তখন বলল, 'আমায় বিয়ে করবে? সব সময়মতো করে দেব।'

ছেলে বলল, 'করব।'

কন্যে বলল, 'এখন ঘুমোও, কাল সকাল-সকাল উঠে রুটি নিয়ে যেয়ো।'

কন্যে বেরিয়ে এল সেই প্রকাণ্ড মাঠে, কী তার শিস! মটমট করে সব ভাঙে, ঘটঘট করে শব্দ হয়। নিজে থেকেই হাল পড়ে মাঠে, নিজে থেকেই গম বোনা হয়ে যায়। ভোর হবার আগেই কন্যে বানিয়ে ফেলল পুরুষ্ট রুটি, দিল সেটা কুমারকে, সেও তা নিয়ে গেল নাগিনির বাড়ি, রাখল টেবিলের ওপর।

ঘুম ভাঙল নাগিনির, বাইরে বেরিয়ে এসে অবাক মানে, মাঠে ফসল গাদি করা। তখন সে ছেলেকে বলল, 'তা করতে পেরেছ বটে। তবে দেখো, আরেকটা কাজও যেন হয়।' এই বলে সে হুকুম দিল, 'এই পাহাড়টা খোঁড়ো, এখান দিয়ে যেন বয়ে যায় নিপার নদী। আর নদীর পাড়ে বানাবে গমের গোলা, জাহাজগুলো যেন ভেড়ে এখানে, সব গম বিক্রি করে দেবে তাদের। আমি সকালে উঠব, সব যেন তৈরি থাকে।'

ফের গেল সে থামের কাছে, হাহাকার করে কাঁদে। নাগিনি-কন্যে ফের তাকে শুধায়, 'কাঁদছ কেন?'

নাগিনি যা হুকুম করেছে, সব সে বলল তাকে।

কন্যে কিন্তু বলল, 'ঘুমোতে যাও, সব ঠিকঠাক হবে।'

আর কী তার শিস! দুখান হয়ে গেল পাহাড়, তার ভেতর দিয়ে বইল নিপার নদী। তীরে তৈরি হচ্ছে গমের গোলা। তখন কন্যে এল তাকে জাগিয়ে দিতে, জাহাজ থেকে যে-সদাগররা নামছে, তাদের কাছে যাতে সে গম বেচতে পারে।

ঘুম ভাঙলে অবাক মানে নাগিনি, যা-যা বলেছিল, ঠিক সেসবই ঘটেছে।

তখন তিন বারের বার তাকে ধাঁধায় ফেলল সে, 'এই রাতের মধ্যেই সোনার খরগোশ ধরে সাতসকালে নিয়ে আসবি আমার বাড়িতে।'

ফের সে গেল সেই থামের কাছে, কেঁদে বুক ভাসায়। নাগিনি-কন্যে জিজ্ঞেস করল তাকে, 'কী হুকুম করেছে?'

'সোনার খরগোশ ধরতে বলেছে।'

কন্যে তখন বলল, 'নাহ্, এটা তেমন ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কে জানে সোনার খরগোশ কোথায়, কী করে ধরতে হবে। তা কী করা যাবে— চলো, যাই ওই পাহাড়টায়।'

তাই গেল। কন্যে বলল, 'তুমি গর্তটার মুখে দাঁড়াও। তুমি ধরবে, আমি তাড়া দেব। যাই বেরোক, তাকেই ধরবে— সেই-ই হল সোনার খরগোশ!'

গেল সে তাড়া দিতে। এদিকে গর্ত থেকে বেরোল তক্ষক, ফোঁস ফোঁস করছে, তাকে সে ছেড়ে দিল। কন্যে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে শুধাল, 'কী, কেউ বেরোয়নি?'

'ও কিছু না, বেরিয়েছিল এক তক্ষক, ভয় লাগল, দিলাম ছেড়ে।'

কন্যে তখন বলল, 'ধুৎ, কী লোক তুমি! ওটাই যে সোনার খরগোশ। শোনো, আমি আবার যাচ্ছি। কেউ যখন বেরিয়ে এসে বলবে, ওখানে সোনার খরগোশ নেই, বিশ্বাস করো না, ধরবে তাকে।'

ভেতরে ঢুকল কন্যে, তাড়া দেয় সেখান থেকে। বেরিয়ে এল এমন থুত্থুরে এক বুড়ি যে, বলবার নয়। ছেলেকে সে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে বাছা দাঁড়িয়ে আছ কীসের জন্যে?'

ছেলে বলে, 'সোনার খরগোশের জন্যে।'

বুড়ি বলল, 'সোনার খরগোশ এখানে থাকবে কোত্থেকে? খামোখাই দাঁড়িয়ে আছ।' এই বলেই পালিয়ে গেল বুড়ি। বেরিয়ে এল কন্যে, শুধাল, 'কী, খরগোশ নেই? কেউ বেরোয়নি এখান থেকে?'

'ওই বেরিয়েছিল এক থুত্থুরে বুড়ি। জিজ্ঞেস করল, কীসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি? বললাম, সোনার খরগোশের জন্যে। বুড়ি বলল, এখানে ওসব নেই। তা আমি ওকে ছেড়ে দিলাম।'

এই শুনে কন্যে বলল, 'কী করলে তুমি! ওটাই তো সেই খরগোশ। এখন আর ওকে কোথাও পাওয়া যাবে না। শোনো, আমি নিজেই সোনার খরগোশ হয়ে যাব, তুমি আমায় নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখবে। ওর হাতে দেবে না কিন্তু, তাহলেই ও টের পেয়ে যাবে, তোমায় আমায় দুজনকেই কুটিকুটি করবে।'

তা-ই দাঁড়াল, কন্যে হয়ে গেল সোনার খরগোশ, তাকে সে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে নাগিনিকে বলল, 'এই আপনার খরগোশ, এবার আমি চললাম আপনার কাছ থেকে।'

'বেশ যাও।'

চলে গেল সে। বাড়ি থেকে নাগিনি বেরোতেই খরগোশ হয়ে গেল পরমাসুন্দরী কন্যে, ছুটল কুমারের সঙ্গ ধরতে। একসঙ্গে পালাতে লাগল দুজনে। এদিকে নাগিনি বুঝতে পেরে গেছে যে, ওটা খরগোশ নয়, তারই মেয়ে। ওদের ধরে আনার জন্যে লোক পাঠাবার তোড়জোড় করতে লাগল। ওদিকে ওরা টের পায়— মাটি ককিয়ে উঠছে। কন্যে তখন বলল, 'এই রে, পিছু ধাওয়া করেছে আমাদের! আমি গম খেত হয়ে যাব, আর তুমি হবে বুড়ো। তোমায় যখন জিজ্ঞেস করবে, "এক ছোকরা আর ছুকরিকে দেখেছ কি?" বলবে যে, এখান দিয়ে তারা গেছে যখন গমের বীজ বোনা হচ্ছিল।'

তারপরে তো পিছু ধাওয়া করে উড়ে এল নাগ, বুড়োকে শুধোয়, 'আচ্ছা, এখান দিয়ে ছোকরা-ছুকরিকে যেতে দেখেছ দাদু?'

বুড়ো বলে, 'গেছে এখান দিয়ে।'

নাগ শুধোয়, 'কতক্ষণ আগে?'

বুড়ো বলে 'যখন এই গম বোনা হচ্ছিল।'

নাগ বলল, 'আরে, এ-গম যে কাটার সময় হয়ে এল, অথচ ওরা পালিয়েছে গতকাল।'

তাই ফিরে গেল। নাগকন্যা আবার হয়ে গেল মানুষ আর বুড়ো নওল কিশোর। ফের ছুট লাগাল। বাড়ি ফিরল নাগ, নাগিনি শুধায়, 'কি, ধরতে পারলে না? পথে দেখনি কাউকে?'

নাগ বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছিলাম— গম পাহারা দিচ্ছিল বুড়ো, আমি তাকে শুধালাম, এক ছোকরা আর ছুকরিকে সে দেখেছে কি, গেছে কি ওখান দিয়ে। সে বলল, "গেছে যখন ওই গম বোনা হচ্ছিল।" আর গমের তো সময় হয়ে এসেছে কাটার। তাই ফিরে এলাম।'

নাগিনি তখন বলল, 'কী করেছ তুমি! এ যে ওরাই! ফের তাড়াতাড়ি ছোটো ওদের পেছনে।'

উড়ছে নাগ। কন্যা আর কুমার শুনতে পায়, কী গর্জন করছে মাটি, উড়ে আসছে সে। কন্যে তখন বলল, 'আমি একটা পুরোনো কেল্লা হয়ে যাব, তুমি হবে সেপাই। যেই জিজ্ঞেস করবে, "অমন কাউকে দেখেছ কি?" বলবে, "দেখেছিলাম যখন এই কেল্লাটা বানানো হচ্ছিল।" '

উড়ে এল নাগ, সেপাইকে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে লশকর, এখান দিয়ে এক ছোকরা আর ছুকরিকে যেতে দেখেছ কি?'

সেপাই বলল, 'দেখেছিলাম, যখন কেল্লাটা বানানো হচ্ছিল।'

নাগ বলল, 'ওরা পালিয়েছে গতকাল আর এ-কেল্লা বানানো হয়েছে, কে জানে কবে।'

এই বলে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরে এসে নাগিনিকে বলল, 'দেখলাম এক সেপাই পায়চারি করছিল কেল্লার কাছে, জিজ্ঞেস করতে বলল, পালিয়েছে যখন কেল্লা গড়া হচ্ছিল। কেল্লা গড়া হয়েছে, কে জানে কবে, অথচ ওদের তো পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে।'

এই শুনে নাগিনি বলল, 'কেন তুমি ওই সেপাইকে টুকরো টুকরো করনি, গুঁড়ো করে দাওনি কেল্লাটা? ও যে ওরাই! এবার তাহলে আমাকেই যেতে হচ্ছে।'

এই বলে সে ছুটল। ছুটছে নাগিনি, ছুটছে। আর ওরা দেখে মাটি গজরাচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে। কন্যে বলল, 'এবার আমরা গেছি, মা নিজেই আসছে! নাও, তোমায় আমি নদী করে দিই, আর নিজে হব কই মাছ।'

তা-ই হল। নাগিনি ছুটে এসে নদীর দিকে চেয়ে বলল, 'কি, পারলে পালাতে?'

নাগিনি হয়ে গেল দাঁতাল বান মাছ, ধরতে গেল কই মাছকে। এই ধরে-ধরে, কই অমনি তার কাঁটা-কাঁটা পাখনা মেলে তাকে ঠেকায়, ধরতে আর পারে না। ধাওয়া করে করে হয়রান হয়ে গেল। ঠিক করল নদীটাকেই গিলে খাবে। খায়, খায়, জল খেয়ে খেয়ে ভরে উঠল পেট, ঢোল হয়ে উঠল, আরও বেশি ঢোল হতেই গেল ফেটে।

তখন মাছরূপী কন্যে বলল নদীরূপী কুমারকে, 'আর আমাদের ভয় নেই। চলো যাই বাম দিকে তোমার বাবা-মার কাছে। তবে দেখো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে সবাইকে চুমু খাবে, কিন্তু ভাইপোকে খেয়ো না। ওই কচিটাকে চুমু খেলেই আমায় ভুলে যাবে। আর আমি তখন কারো ঘরে খেতমজুরানির চাকরি নেব।' তা ছেলে তো বাড়ি ঢুকল, সবাইকেই কুশল জানাল। কিন্তু মনে মনে ওই চিন্তা— ভাইপোটিকে আদর না করে চলে কেমন করে? সবাই যে খারাপ ভাববে। কাছে গিয়ে খোকনকে চুমু খেল সে। আর চুমু খেতেই ভুলে গেল পরমাসুন্দরী কন্যের কথা। দিন কাটল, কে জানে কতদিন, বিয়ে করার ইচ্ছে হল ছেলেটির। সবাই একটি ভালো কন্যের কথা বলল। কিন্তু যে তাকে নাগিনির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, তার কথা ভুলে গিয়ে, সে এই মেয়েটির সঙ্গেই বাগ্‌দান করল। তারপর বিয়ের আগে এক সন্ধ্যায় গাঁয়ের সব মেয়েকে ডাকা হল সাঁঝবাসরে। ডাকা হল সেই মেয়েটিকেও, যার সঙ্গে সে পালিয়েছিল নাগিনির কাছ থেকে। অবশ্য কেউ জানত না, কে সে, কোত্থেকে এল। গান গাইতে লাগল সবাই, পিঠে বানাতে বসল। সে-মেয়েটি ময়দার তাল দিয়ে নোটন-নোটনি পায়রা বানিয়ে ছুড়ে দিল ওপরে, অমনি তারা জীবন্ত হয়ে ওড়াউড়ি করতে লাগল। নোটনি বকমবকম করে উঠল, 'ও নোটন, ও নোটন, ভুলে গেছ যে, তোমার জন্যে আমি গম বুনেছিলাম মাঠে, নাগিনির কাছে নিয়ে যাবে বলে রুটি বানিয়েছিলাম!'

নোটন বলে, 'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, ভুলে গেছি!'

ফের নোটনি শুধায়, 'ভুলে গেছ, তোমার জন্যে আমি পাহাড় দুখান করে নিপার নদী বইয়ে দিয়েছিলাম, যাতে জাহাজ আসে, গম বেচে দাও তাদের কাছে!'

নোটন বলে, 'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, ভুলে গেছি!'

ফের নোটনি শুধায়, 'ভুলে গেছ যে, আমরা দুজনে গিয়েছিলাম সোনার খরগোশ ধরতে? আমায় ভুলে গেছ তুমি?'

নোটন জবাব দেয়, 'ভুলে গেছি, ভুলে গেছি, ভুলে গেছি!'

তখন সেই নাগিনি-কন্যের কথা মনে পড়ল কুমারের। নতুন কন্যেকে বিদায় দিয়ে মালা বদল করল তার সঙ্গে। এখন তাদের দিন কাটছে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে। ■

এবারের পাতায় রয়েছে পাথরচাপুড়ি মালদা ও সূর্যপুর ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের লেখা।

ভূতের নামতা

ফারহানা সুলতানা
অষ্টম শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

এক দুই তিন
অমাবস্যার দিন।
চার পাঁচ ছয়
লাগছে আমার ভয়।
সাত আট নয়
ভূতটা ছায়াময়।
দশ এগারো বারো
ভয়ে থরোথরো।
তেরো চোদ্দো পনেরো
ভূত তুমি মরো।
ষোলো সতেরো আঠারো
ভূতের শ্রাদ্ধ করো।
উনিশ আর কুড়ি
এবার চলো বাড়ি।

অতিথি

আয়েষা রহমান
দ্বাদশ শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

কিছু ব্যথা চাপা থাকে নীরব এই মনে,
কিছু ব্যথা জেগে ওঠে শুধু ক্ষণে ক্ষণে।
কিছু কথা কাউকে দেয় কষ্ট বার বার,
কিছু কথা দেয় কাউকে আনন্দ শত বার।
কেউ বলে সুখ তুমি আমার কাছে এসো,
কেউ বলে দুঃখ তুমি আমায় ভালোবেসো।
কারোর কাছে একটু সুখ দুঃখেরই ভেলা,
কারোর কাছে সুখ নাকি আনন্দের মেলা।
কিছু হাসি কিছু কান্না জীবনের এই রীতি,
কারোর কাছে দুঃখ আবার জীবনের অতিথি।

হাউজ দ্যাট

জাসমিন খাতুন
দ্বাদশ শ্রেণি, পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস

ছাগলপণ্ডিত ব্যাট ধরেছে
কুকুর করছে বল,
দর্শকেরা এলেন সবাই
গোরু-ভেড়ার দল।
সিংহমশায় আম্পায়ার যে
খুব জমেছে ম্যাচ,
ভালুকভাইয়ের হাড় ভেঙেছে
ধরতে গিয়ে ক্যাচ।
শক্ত করে ব্যাট ধরেছে
মারছে ছয় আর চার,
হাওয়ার বেগে বল ছুটেছে
স্টেডিয়ামের পার।
ছাগল-ভায়া খুব রেগেছে
খুব মেরেছে চার,
কুকুরভাইয়ের ঘাম ছেড়েছে
আউট হয় না আর।
ছাগল-ভায়া বিশাল জোরে
পায়ে মেরেছে ব্যাট,
এদিক থেকে কুকুরভাই
বলেন, 'হাউজ দ্যাট!'

মিলিয়ে লিখি

মীম আক্কাস
দ্বাদশ শ্রেণি, সূর্যপুর ক্যাম্পাস

প্রচণ্ড এই গরমে মা কষ্টে আছি খুব।
পেতাম যদি শীতল দিঘি, দিতাম লম্বা ডুব।
মাথার ওপর ফ্যান ঘুরে যায়, সকাল থেকে ঘামি।
বিকেল হল, ইচ্ছে হয় না খেলতে মাঠে নামি।

সন্ধে হল, সুপার এল, পড়তে বলার জন্য।
পড়তে বসে মন যে ভাবে, FIFA কিংবা অন্য।
রাত্রি হল, পড়া না-হল, ঘুমোতে না-ইচ্ছা করে।
ভীষণ গরম, মধ্যরাতে বারংবার শ্বাস পড়ে।

মিলিয়ে লেখার জন্যে নতুন ছড়া এবার দেওয়া হল না। এই ছড়ারই প্রথম চার লাইন মিলিয়ে আরও লেখা মিশনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আশা করা হচ্ছে।

বসন্ত

মহম্মদ মফিক সেখ
একাদশ শ্রেণি, মালদা ক্যাম্পাস

পলাশ বকুল আমের মুকুল
মধু এসেছে গাছে,
সবুজ ধানে বাউল গানে
মনটা শুধুই নাচে।
কোকিল দূরে ডাকছে সুরে
ঢেউ দিয়েছে দোলা,
আয়রে ছুটে বাঁধন টুটে
মনটা রেখে খোলা।

আল-আমীন মিশন: তথ্য ও পরিসংখ্যান

মিশনের বিস্তার

- কাজের পরিধি: পশ্চিমবঙ্গের ১৫-টি জেলায় এবং অসম ও ঝাড়খণ্ডে।
- মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ৬৭-টি। মোট ছাত্রছাত্রী: ১১৬৬৭ জন।
- আবাসিক ক্যাম্পাস: ৪১-টি। আবাসিক ছাত্রছাত্রী: ৭৪৫৬ জন।
- পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী: ৩৭১৬ জন (ছাত্র: ২৬৮৯ জন, ছাত্রী: ১০২৭ জন)।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী: ৩০৪৩ জন (ছাত্র: ১৯৮২ জন, ছাত্রী: ১০৬১ জন)।
- জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও বিসিএস কোচিংয়ে ৬৯৭ জন (ছাত্র: ৫২৭ জন, ছাত্রী: ১৭০ জন)।
- দুঃস্থ, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী: ১৮৩৭ জন (২৫%)।
- নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী: ৩০৫২ জন (৪১%)।
- মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রী: ২৫৬৭ জন (৩৪%)।

দশ বছরে ক্রমবর্ধমান আবাসিক ছাত্রছাত্রী

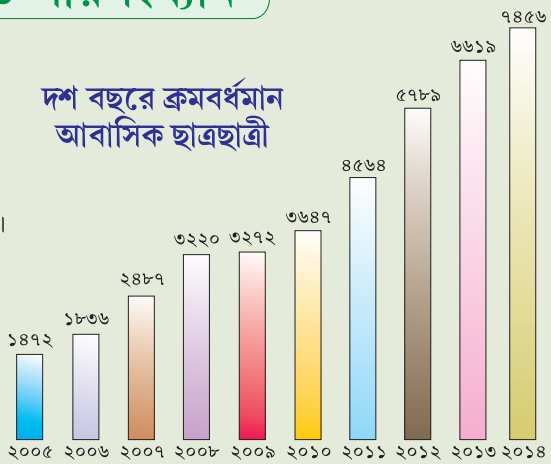

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে (মেডি. ও ইঞ্জি.) দশ বছরের সফল ছাত্রছাত্রী

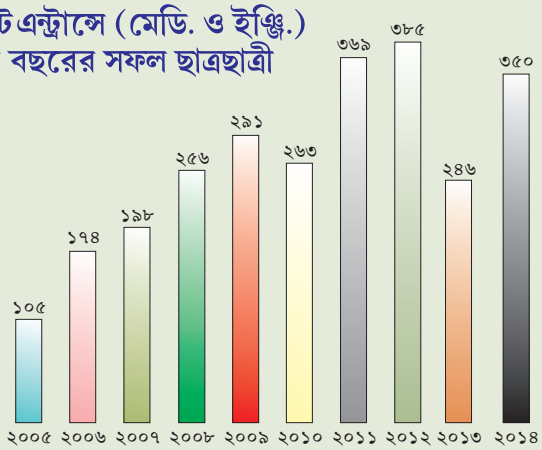

জেলাভিত্তিক আবাসিক ছাত্রছাত্রী

মুর্শিদাবাদ	১৯৭৮	হুগলি	২৩০
মালদা	১২২৯	পূর্ব মেদিনীপুর	১২৫
বীরভূম	৬৩৮	বাঁকুড়া	১০৮
দ. ২৪ পরগনা	৬০২	কুচবিহার	৭০
নদীয়া	৪৮৭	কলকাতা	৩৯
বর্ধমান	৪২৪	পুরুলিয়া	২১
হাওড়া	৩৪৭	জলপাইগুড়ি	১৪
উ. ২৪ পরগনা	৩২৪	দার্জিলিং	০২
দ. দিনাজপুর	২৯৪	অসম	২২
উ. দিনাজপুর	২৪৭	ঝাড়খণ্ড	১৯
প. মেদিনীপুর	২৩১	অন্যান্য	০৫

প্রাক্তনী পরিসংখ্যান

- মাধ্যমিক পাস করেছে ৩৮৮৬ জন।
- উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে ৬৪৫৩ জন।
- মেডিকেলে ১১১৪ জন, পাস করেছে ৫৪৫ জন।
- ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৬৪৯ জন, পাস করেছে ৯৭২ জন।
- ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় সফল হয়ে কর্মরত ২০ জন।
- বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত ৫৯৭ জন।
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ছে ২৪৫৬ জন।

দশ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

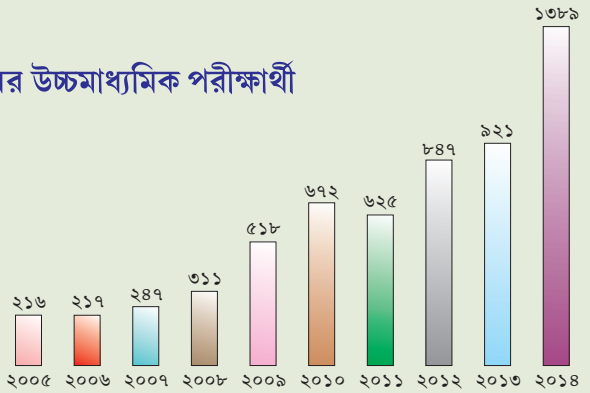

দশ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

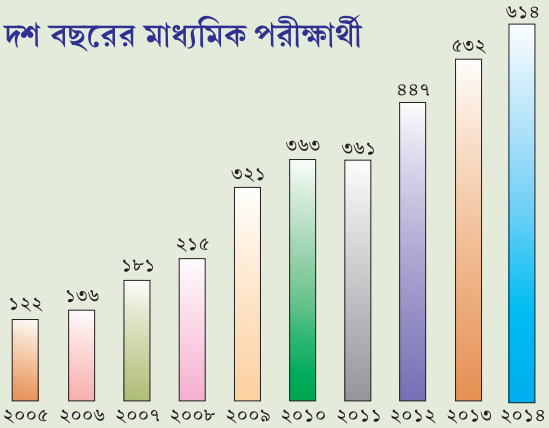

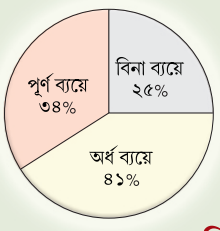

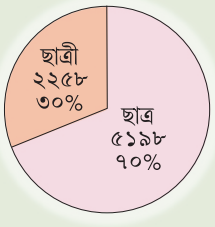

ভর্তি বিষয়ক তথ্য ২০১৫

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি

- ফর্ম পাওয়া যাবে ২৯.০৮.১৪ থেকে।
- ফর্ম জমা দেওয়া যাবে ৩০.০৯.১৪ পর্যন্ত।
- প্রবেশিকা পরীক্ষা ০২.১১.১৪ রবিবার।

একাদশ শ্রেণি বিজ্ঞান বিভাগ

- ফর্ম পাওয়া যাবে ১২.১২.১৪ থেকে।
- ফর্ম জমা দেওয়া যাবে ১৮.০২.১৫ পর্যন্ত।
- প্রবেশিকা পরীক্ষা ০৮.০৩.১৫ রবিবার।

সেরা মেধাবীদের সেরা প্রতিষ্ঠান ▮ উচ্চতায় অদ্বিতীয় উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

একনজরে সাফল্য ২০১৪

ওমর আলি
মেডি. ৩২

সাজিদ আহমেদ
মেডি. ৩৩

ইনজামামুল হক
মেডি. ৩৪

জোহেব মণ্ডল
মেডি. ৩৮

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল

মেডিকেল	১০০০-এর মধ্যে	১৪০০-এর মধ্যে	১৮০০-এর মধ্যে	২২০০-এর মধ্যে
	১০৪ জন	১৩৭ জন	১৬১ জন	১৯২ জন
ইঞ্জিনিয়ারিং	২০০০-এর মধ্যে	৫০০০-এর মধ্যে	১০০০০-এর মধ্যে	১৫০০০-এর মধ্যে
	১৪ জন	৫৭ জন	১১২ জন	১৫৮ জন

উচ্চমাধ্যমিকের ফল

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র (বিজ্ঞান)	৯১৫	১০	৭১	২১৩	৪৩৯	৬৩৫	৮৫৪	৯১.৮%
ছাত্রী (বিজ্ঞান)	৪৪৯	০১	১৯	৮৫	১৯৩	২৮৮	৪০৪	৯০.০%
ছাত্রী (কলা)	২৫	—	০১	০৫	১২	১৭	১৯	৮৪.৬%
মোট	১৩৮৯	১১	৯১	৩২১	৬৪৪	৯৪০	১২৭৭	—

মাধ্যমিকের ফল

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	৪২৪	৮৩	২১৭	৩১৮	৩৬৬	৩৯০	৪১৫	৯৫.১%
ছাত্রী	১৯০	২৭	৭৪	১১২	১৩৬	১৬৩	১৮১	৯৫.৭%
মোট	৬১৪	১১০	২৯১	৪৩০	৫০২	৫৫৩	৫৯৬	—

তাবাসসুম খাতুন
মেডি. ৫৮

মেহজাবীন পারভিন
মেডি. ৮২

রুনা লায়লা
মেডি. ১১২

নিশা খাতুন
মেডি. ১১৫

মহ. সাজিদ মল্লিক
মেডি. ৪০

সাহারুখ হোসেন
মেডি. ৫১

বুলবুল সেখ
মেডি. ৬৫

সেখ হাসানুর জামাল
মেডি. ৭৫

মহ. সামিম আক্তার
মেডি. ৯০

মতিউর রহমান
মেডি. ৯৫

কাজী রৌনক হোসেন
মেডি. ১৪৪

বুলবুল সরদার
মেডি. ১৬০

তারিক আহমেদ
ইঞ্জি. ৫৯৯

মহ. হাসেম আলি
ইঞ্জি. ৮২১

আবু তাহির
ইঞ্জি. ১০৫১

মিজান আহমেদ
ইঞ্জি. ১১৭৭

সেরু মোমিন
ইঞ্জি. ১২৩০

আমির সোহেল
ইঞ্জি. ১২৪১

সাইফুল হক
ইঞ্জি. ১২৯১

আরিফুল মোল্লা
ইঞ্জি. ১৫৮০

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ফোন: (০৩২১৪) ২৫৭ ৭৯৬/৮০০, ৯৪৩৪৬ ২০৯২০
সেন্ট্রাল অফিস: ৫৩ বি, ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ৩৭৬৯; ৩২৯৭ ৩৫৮০